লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

# The Fortnightly Ahmadi

*Since 1922*


নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১২ রবি. সানি, ১৪৩৯ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ ঈসাব্দ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত

# ‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’

## পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

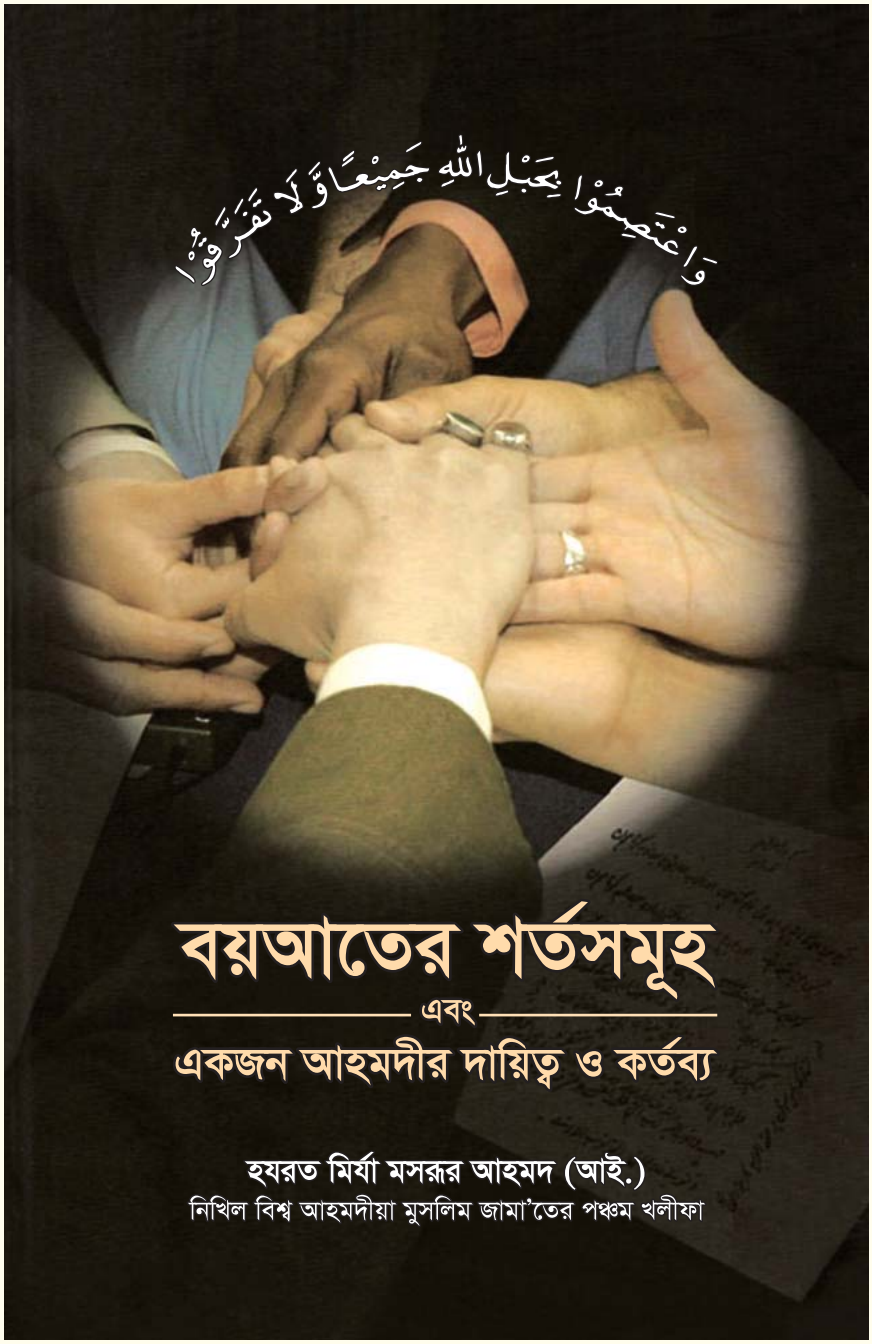


পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

**মোবাশশের উর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত,
বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি?
প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

# সম্পাদকীয়

## একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় আল্লাহর সমীপে নিবেদিত নিজ দেশের প্রতি আনুগত্যে বিশ্বস্ত আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে সদা সচেতন ও যত্নবান

একজন মুসলিমের জন্য তার নিজ দেশের প্রতি অনুগত থাকাটা তার ধর্মবিশ্বাস লালনের পথে কোন বিরোধ বা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে কি?

বিশ্বের অনেক অংশে এখন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে স্বায়ত্তশাসন দাবি করছে। এমনকি এর ফলে তাদের কোন কোন দল বা গোষ্ঠি আন্দোলনের নামে যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠেছে। নিজেদের ধর্মের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের উন্মাদনায় সারা বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাসবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ প্রায় সর্বত্র দ্বন্দ-সংঘাত বেড়েই চলছে। রাজনৈতিকভাবে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে আর প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বা অন্যান্য অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধারে বৈধ-অবৈধ সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগে লিপ্ত তারা।

যাহোক, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, কোন এক ধর্মীয় গোষ্ঠির সব সদস্যরা একসাথে মিলেমিশে করা এই যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়ে রাষ্ট্র লাভের পর তাদের মধ্যে একই ধর্মে ভিন্ন মত পোষণকারী সংখ্যালঘুদের অবস্থা কিরূপ হবে? তারা কি আবারো মারামারি হানাহানিতেই নিমজ্জিত হবে?

এর উত্তর আমরা জানি। সত্য হল, ধর্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা এমন এক অমূল্য সম্পদ যা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত অভিযাত্রায় প্রাপ্ত হয়ে থাকে, আর তা অর্জিত হয় আল্লাহর সাথে ব্যক্তির এক জীবিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন আর ক্রমান্বয়ে তার প্রবৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে নিজ বিশ্বাসে পরিপূর্ণতা এনে। কোন ব্যক্তি তার আচরিত ধর্মীয় অনুশাসনমালাকে যুক্তি-তর্কে অপরাপর বিশ্বাসগুলোর সাথে যখন তুলনামুলক বিশ্লেষনে নিজের লালিত ঈমানকে বর্ণিল শোভায় সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপে দেখে তখন ঈমানে সে আরো বলীয়ান হয়ে উঠে। অতএব, যে ধর্ম সত্য, যৌক্তিক বিশ্লেষণ বা উদ্ভাবনামুলক গবেষণায় তা কোনক্রমেই ভীত হতে পারে না।

নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পালনীয় প্রশ্নাতীত এক নির্দেশনা , কারণ এটি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধর্মীয় অনুশাসন পালনে সহনশীল রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব, এর ব্যতিক্রম ঘটানো হলে অবধারিতভাবে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দণ্ডিত হতে হয়; জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই।

মুসলমানদের উচিত, নিজ নিজ দেশের সংসদ সদস্যকে সব ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল হতে উৎসাহিত করা , এবং নির্যাতন নিপীড়নের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে পরস্পরের সম্মান বজায় রেখে উন্মুক্ত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ চালানো যে, প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গঠণ করা হলে পরিস্থিতি যা দাঁড়ায়, তাতে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আদৌ কি এর কোন যৌক্তিক গ্রাহ্যতা থাকে?

ইসলামের ইতিহাসে, ধর্মীয় সহনশীলতা চর্চার এবং ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্ব গবেষণার জন্য স্পেনস্থ আল-আন্দালুসের মত মহান সভ্যতা সর্বজন স্বীকৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আর সাংস্কৃতিক চর্চায় আধুনিক কালের অনেক রাষ্ট্র আজ পর্যন্তও তাদের সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে নি।

তবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, এই বাংলাদেশে ধর্মীয় সহনশীলতার এক ঐতিহ্য আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। সারা দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মসজিদ মন্দির গীর্জা প্যাগোডা ইত্যাদি, এসবই হলো আমাদের মাঝে সব ধর্মের মানুষে বিরাজমান সৌহার্দ্র-সম্প্রীতি বন্ধনের সুদৃঢ় অবস্থান, আর তা অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন।

মসজিদ শব্দ 'সেজদা' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো বিনয়, নম্রতা ও বিশ্বস্ততার সাথে সমর্পিত হওয়া। অতএব,মসজিদ হলো এসব উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করার স্থান। আর এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে, যখন নামাযের সময় হয় তখন মসজিদে একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'লার সমীপে বিনত হয়ে স্বীয় সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে তাঁকে ডাকো।

**হে আল্লাহ্! তুমিই সেই সত্তা, যে আমাদেরকে সোজা সরল পথে পরিচালিত করে থাকো। তুমি আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করো আর খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের সামর্থ্য দান করো।**

# সূচিপত্রে

**৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭**


**কুরআন শরীফ** ৩

**হাদীস শরীফ** ৪

**অমৃত বাণী** ৫

**'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড)** ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা** ৯

**ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)** ১৮
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

**বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান** ২০
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

**'আখলাকে আহমদ' অর্থাৎ 'আহমদ'-এর চারিত্রিক গুণাবলী** ২৩
মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান

**কলমের জিহাদ** ২৫
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

**নামায আদায় প্রশান্তি লাভের উপায়** ২৭
মাহমুদ আহমদ সুমন

**আমি কিভাবে আহমদী হলাম** ২৯
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

**ভুল শুধরাতে ভুলের আশ্রয়** ৩১
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

**দূর্গারামপুর জামা'তে সেবারত থাকাকালীন সময়ের স্মৃতিকথা** ৩৪
শরীফ আহমদ আফ্রাদ

**ইসলাম: বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ** ৩৬
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

**সংবাদ** ৩৯

**বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক** ৪০



পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন–
**www.ahmadiyyabangla.org**

# কুরআন শরীফ

## সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٠﴾

২০। আর মু'মিন হওয়া অবস্থায় যে পরকালের কল্যাণ চায় এবং এর[১৬০৪] জন্য যথোচিত চেষ্টা করে তাহলে এদেরই চেষ্টাপ্রচেষ্টার কদর করা হবে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢١﴾

২১। আমরা এদের (অর্থাৎ ধার্মিকদের) এবং তাদের (অর্থাৎ দুনিয়াদারদের) সবাইকে তোমার[১৬০৫] প্রভু-প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করে থাকি। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দান (কোন গোষ্ঠীর জন্য) সীমাবদ্ধ নয়।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢٢﴾

২২। দেখ! আমরা কিভাবে (জাগতিক সম্পদের দিক থেকে) তাদের কিছু সংখ্যক লোককে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর মর্যাদা (লাভের) দিক থেকে পরকালের (জীবন) অবশ্যই অনেক বড় এবং উৎকর্ষ (লাভের) দিক থেকেও অনেক বড়।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٣﴾ ع ٢

২৩। তুমি আল্লাহর[১৬০৬] সাথে অন্য কোন উপাস্য দাঁড় করাবে না। অন্যথায় তুমি লাঞ্ছিত (ও) পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।

---

১৬০৪। 'এর' সর্বনামটি পরকালকে ইঙ্গিত করছে এবং এখানে 'এর' অর্থ হলো কেবল সেসব প্রচেষ্টা, যা পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। তা-ই প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হবে।

১৬০৫। ঐশী সাহায্য দু'প্রকার হয়ে থাকে : (১) সাধারণ সাহায্য যার ফলে মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ইত্যাদি সব মানুষের সব ধরনের সুকর্মের ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্মের পরিধি ও প্রসার অনুযায়ী ফল লাভ করে, (২) আল্লাহ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং বিপদে সাহায্য, যা আধ্যাত্মিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কেবলমাত্র আল্লাহর প্রকৃত বান্দাকেই তা দান করা হয়ে থাকে, অবিশ্বাসীদেরকে নয়।

১৬০৬। শিরক (আল্লাহ তা'লার সাথে মিথ্যা উপাস্যকে শরীক করা) করলে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন ঘটে। 'শিরক'এ ডুবে যাওয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায় প্রকৃত নৈতিক বা জাগতিক উন্নতি সাধন করেছে বলে জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সব অশুভের উৎপত্তি হয় শিরক থেকে।

# হাদীস শরীফ

# হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার শত্রুতার জন্মদাতা

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করে না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে লোকের সাথে তার মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে বলা হয় এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে।

**কুরআনঃ**

**"নিশ্চয় মু'মিনরা একে অপরের ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন করো, আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়"** (সুরাতুল হুজুরাত : ১১)।

**হাদীসঃ**

আন আবিহুরায়রাতা আন্না রসূলাল্লাহে ক্বালা তুফতাহু আবওয়াবুল জান্নাতে ইয়াওমাল ইসনায়নে ওয়া ইয়াওমাল খামীসে ফাইউগফারু লিকুল্লি আবদিন লা ইউশরিক বিল্লাহি শাইয়ান ইল্লা রাযুলান কানাত বায়নাহু ওয়া বায়না আখীহে শাহনাউ ফাইউকালু আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা আনযিরু হাযায়নে হাত্তা ইয়াসতালিহা। (মুসলিম)

অর্থাৎ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করে না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে লোকের সাথে তার মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে বলা হয় এদের অবকাশ দাও যেন নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। (মুসলিম)

**ব্যাখ্যাঃ**

আমাদের জীবন এক চলমান বাস্তবতা। এ বাস্তবতার সামনা-সামনি হতে হলে এমন এক পরিপূর্ণ বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্রে ভরে দিতে পারে। পবিত্র কুরআন আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার ও সৌহার্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাউকে অবজ্ঞা করা বা কাউকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা এমন ব্যাধি যা মানবতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়।

তাই কুরআন বলে, তোমরা হিংসা আত্মগরিমা ও অহংকার হতে মুক্ত হও।

হুযূর (সা.) আমাদের এমনই একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে হুযূর (সা.) জানাচ্ছেন আল্লাহ্‌র রহমতের কথা। শত্রুতার জন্মদাতা হলো হিংসা-বিদ্বেষ আত্মগরিমা ও অহংকার। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) জানাচ্ছেন, আল্লাহ্ এ বিষয়টিকে অপসন্দ করেন। তিনি শাস্তি দিতে চান তথাপি তিনি তাঁর দয়া ও মমতার কারণে বান্দাকে সুযোগ দেন যেন মানুষ নিজের সংশোধন করে নিতে পারে। এ বিষয়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ্'-তে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন শত্রুতায় আক্রান্ত না হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক উম্মতে পরিণত হতে পারি, আমীন।

**আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

# হৃদয়ের কঠোরতা ও অবজ্ঞা ছেড়ে সহানুভূতিশীল হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

**হযরত ইমাম মাহদী (আ.)**

"খোদার অনুগ্রহ সর্বব্যাপক। তা সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল যুগকে ঘিরে রেখেছে। এর কারণ হলো, কোন জাতি যেন অভিযোগ করার সুযোগ না পায় এবং একথা বলতে না পারে খোদা অমুক অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কিন্তু আমাদের প্রতি তা করেন নি বা অমুক জাতি তাঁর পক্ষ থেকে সত্য পথ পাওয়ার জন্য ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে, কিন্তু আমরা পাই নি বা অমুক যুগে তিনি তাঁর বাণী ও অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত করেছেন, কিন্তু আমাদের যুগে তিনি গোপন রয়েছেন। অতএব তিনি ব্যাপক অনুগ্রহ দেখিয়ে এ সকল আপত্তি খণ্ডন করে দিয়েছেন এবং নিজের সর্বব্যাপক গুণ এভাবে দেখিয়েছেন যে, কোন জাতিকে তিনি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি এবং কোন যুগকেই তিনি বঞ্চিত করেন নি।

অতএব আমাদের খোদার যখন এই নীতি, আমাদেরও এ নীতিরই অনুসরণ করা কর্তব্য। সুতরাং হে আমার স্বদেশবাসী ভাইগণ! এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি, যার নাম 'পয়গামে সুলেহ্' (শান্তির বার্তা) তা সম্মানের সাথে আপনাদের নিকট উপস্থিত করছি এবং সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি সেই সর্বশক্তিমান খোদা নিজেই যেন আপনাদের হৃদয়ে প্রেরণা দান করেন এবং আমার সহানুভূতির প্রকৃত রূপ আপনাদের নিকট প্রকাশ করেন, যাতে আপনারা এ বন্ধুত্বের উপহারকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে না করেন। বন্ধুগণ! পরকালের বিষয়তো সাধারণ লোকের নিকট প্রায়ই গোপন থাকে এবং এর রহস্য কেবল তাদের নিকটই প্রকাশিত হয়, যারা মৃত্যুর পূর্বেই মরে যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে আত্মবিলীন হয়ে যায়– অনুবাদক)। কিন্তু প্রত্যেক সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই পার্থিব ভাল-মন্দ চিনে নিতে পারে।

এ কথা কারো অজানা নেই, একতা এমন একটি শক্তি যে, ঐ সকল বিপদ যা কোনভাবেই দূর হয় না এবং ঐ সকল সমস্যা যা কোন প্রচেষ্টাতেই সমাধান হয় না, তা একতার দ্বারাই সমাধান হয়ে যায়। অতএব একতার কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এমন দু'টি জাতি, দৃষ্টান্তস্থলে বলতে হয়, কোন সময় তাদের মধ্যে হিন্দুরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে বা মুসলমানরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে, এটা এক অসম্ভব ধারণা। বরং এখনতো হিন্দু ও মুসলমানের ভাগ্য এক সুতায় গাঁথা হয়ে গেছে। যদি এক জাতির ওপর বিপদ আসে তবে অন্য জাতিও এর অংশীদার হয়ে যাবে। আর যদি এক জাতি অন্য জাতিকে কেবল নিজেদের অহংকার ও দাম্ভিকতার দরুন লাঞ্ছিত করতে চায় তবে তারাও লাঞ্ছনার কালিমা থেকে রেহাই পাবে না। যদি তাদের মাঝে কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি দেখাতে ত্রুটি করে তবে এর ক্ষতি তাকেও ভুগতে হবে। তোমাদের দু'জাতির যে কেউ অন্য জাতির ধ্বংসের চিন্তা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি শাখায় বসে সেই শাখাকেই কাটে।

আপনারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শিক্ষিতও হয়েছেন, এখন ঈর্ষা ছেড়ে ভালোবাসার দিকে অগ্রসর হওয়াই আপনাদের জন্য শোভনীয়। হৃদয়ের কঠোরতা ও অবজ্ঞা ছেড়ে সহানুভূতিশীল হওয়াই আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তা না হলে আপনাদের অবস্থা পার্থিব সমস্যাবলীতে জড়িয়ে প্রচণ্ড রোদের তাপের সময় মরুভূমিতে ভ্রমণ করার ন্যায় হয়ে যাবে।

অতএব এ দুর্গম পথের জন্য পারস্পরিক একতার সেই শীতল পানির প্রয়োজন, যা এ জ্বলন্ত আগুনকে নিভিয়ে দেবে ও পিপাসার সময় মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে। ('পয়গামে সুলেহ্' বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

# ‘বারাহীনে আহমদীয়া’

## ৩য় খণ্ড

**হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ**
**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)**
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

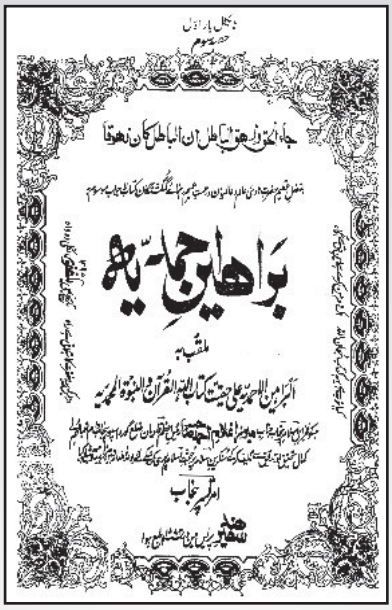

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৪০তম কিস্তি)

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوۡمِهِمۡ فَجَآءُوۡهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ فَانۡتَقَمۡنَا مِنَ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا ؕ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

আমরা তোমার পূর্বে অনেক বার্তাবাহক তাদের স্ব স্ব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি আর তারাও সমুজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করেছে। অবশেষে আমরা সেসব অপরাধীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি যারা এসকল নবীকে গ্রহণ করে নি। মু’মিনদেরকে সাহায্য করা আমাদের অবধারিত দায়িত্ব। (সূরা আর রূম: ৪৮)

وَ لَقَدِ اسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيۡنَ سَخِرُوۡا مِنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ قُلۡ سِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ ثُمَّ انۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُكَذِّبِيۡنَ

আদি থেকে এটিই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে অর্থাৎ আদি হতে খোদার রীতি এভাবেই চলে আসছে যে, সত্য নবীদেরকে ব্যর্থ হতে দেয়া হয় না আর তাদের জামা’ত টুকরো টুকরো হয় না বা বিশৃংখলার শিকার হয় না বরং তারা সাহায্য লাভ করে। তোমার পূর্বেও নবীদের সাথে হাসিঠাট্টা করা হতো, কিন্তু তিরস্কারকারীরা সকল যুগে নিজেদের তিরস্কারের প্রতিফল পেয়েছে। তাদেরকে বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ! যারা খোদার নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছে! (সূরা আল আন’আম: ১১-১২)

وَ قَالُوۡا لَوۡ لَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ اٰيَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ؕ قُلۡ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنۡ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّ لٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ

আর কাফেররা বলে, তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার প্রতি কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নি? তুমি বল, নিদর্শন অবতীর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা খোদা রাখেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা আল আন’আম: ৩৮)

قُلۡ هُوَ الۡقَادِرُ عَلٰۤى اَنۡ يَّبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابًا مِّنۡ فَوۡقِكُمۡ اَوۡ مِنۡ تَحۡتِ اَرۡجُلِكُمۡ اَوۡ يَلۡبِسَكُمۡ شِيَعًا وَّ يُذِيۡقَ بَعۡضَكُمۡ بَاۡسَ بَعۡضٍ ؕ اُنۡظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُوۡنَ

তুমি বল, তিনি তোমাদের নিদর্শন প্রদর্শনের লক্ষ্যে ওপর থেকে কোন শাস্তি

**পাদটিকা-১ চলমান:** সত্য বলতে কী– এ কথা আপনার একটি সন্দেহ বৈ কিছু নয়, যার পক্ষে কোন যৌক্তিক ও কুরআন-হাদীস- ভিত্তিক প্রমাণ দেয়া যাবে না, বরং সঠিক ও নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা এবং কুরআনের সঠিক ও সুদৃঢ় আয়াত এর মিথ্যা হওয়ারই সাক্ষ্য বহন করে। সত্যিকার অর্থে এমন কুমন্ত্রণা কেবল সে সকল লোকদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় যারা ঐশী এলহামের উৎকর্ষ আলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বর্গীয় জ্ঞানের মর্যাদা অনুধাবনে অক্ষম। এছাড়া খোদা যে নিজ অনুসন্ধানীদেরকে বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের অনন্ত মর্যাদায় উপনীত করতে পারেন, সেসব ঐশী দানের বিষয়ে তারা উদাসীন। এরা এ কথা বোঝে না যে, খোদা নিজ বান্দাদের হৃদয়ে নিশ্চিতভাবে স্বর্গীয় জ্ঞান (এলমে লাদুন্নী) অর্জনের এক আকুল প্রেরণা জুগিয়েছেন, অধিকন্তু তাদের পুরো তত্ত্বজ্ঞান, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি এবং পূর্ণ জ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অদৃশ্য প্রেরণায় ব্যাকুল করে তুলেছেন। সেই মহানুভব খোদা এমন নন যে, তাদের আকুল আবেগ ও বেদনা এবং তাদের প্রেমাকুল প্রচেষ্টা ও

অবতীর্ণ করা বা তোমাদের পদতল হতে কোন শাস্তির প্রকাশ ঘটানো অথবা বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করানোর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। দেখ, আমরা কিভাবে নিদর্শনাবলী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি যেন তারা বুঝতে পারে। (সূরা আল আন'আম: ৬৬)

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ قُلْ لَّاۤ
اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ
لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا
يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

আর কাফিররা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? তুমি বল, নিজের ভাল মন্দের ওপর আমার নিজেরই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু খোদা যা চান তাই হয়। সকল জামাতের জন্য একটি নির্ধারিত সময় থাকে, তাদের নির্ধারিত সময় যখন আসে, তখন তারা এক মুহূর্ত পিছিয়েও থাকতে পারবে না আর এগিয়েও যেতে পারবে না। (সূরা ইউনুস: ৪৯-৫০)

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ

তুমি বল, হে আমার জাতি! তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করে যাও আর আমি নিজ স্থানে কাজ করে চলেছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, এ পৃথিবীতে কার ওপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি অবতীর্ণ হয় আর কার ওপর (খোদা) চিরস্থায়ী শাস্তি নাযেল করবেন। (সূরা আয যুমার: ৪০-৪১)

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ
عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ

অর্থাৎ যারা কুফরী করেছে আর খোদার পথে বাদ সাধে, তাদের ওপর পারলৌকিক শাস্তি আমরা পরকাল ছাড়া এ পৃথিবীতেও অবতীর্ণ করবো এবং তারা তাদের নৈরাজ্যের জন্য শাস্তি পাবে। (সূরা আন নাহল: ৮৯)

وَ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ
لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ؕ . . . وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

কাফিরদের দুরভিসন্ধি দেখে তোমার দুঃখভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয়; তারা খোদার ধর্মের কোন ক্ষতি করতে পারবে না আর খোদা তাদের জন্য মহাশাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৭)

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

যেভাবে ফেরাউনের পরিবার এবং এর পূর্বের কাফিরদের অবস্থা হয়েছে। যখন তারা খোদার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার রীতি অবলম্বন করেছে, তখন খোদা তাদেরকে তাদের পাপের শাস্তি দিয়েছেন। নিশ্চয় খোদা মহা শক্তিমত্তার অধিকারী এবং শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা আল আনফাল: ৫৩)

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

তাদের দুষ্কৃতি প্রতিহত করার জন্য তোমার পক্ষে খোদা-ই যথেষ্ট, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (সূরা আল বাকারা: ১৩৮)

وَ اِنَّا عَلٰۤى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ

আমরা তাদের সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিই, তা তোমাকে দেখানোর পূর্ণ ক্ষমতা আমরা রাখি। (সূরা আল মু'মিনূন: ৯৬)

وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ
اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

তারা বলে, এর প্রভুর পক্ষ থেকে এর প্রতি ধর্মের সমর্থনে কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নি? তুমি বল, অদৃশ্যের জ্ঞান খোদারই বিশেষত্ব। সুতরাং, তোমরা নিদর্শনের অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে নিদর্শনের অপেক্ষায় রইলাম। (সূরা ইউনুস: ২১)

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তুমি বল, খোদা সকল অনুপম ও পরমোৎকর্ষ গুণাবলীর আধার। অচিরেই তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শন প্রদর্শন

---

**পাদটিকা-১ চলমান:** কার্যক্রমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন। যতটা ক্ষুধা সৃষ্টি করেছেন ততটা খাবার সরবরাহ করবেন না বা যতটা পিপাসা জাগিয়ে দিয়েছেন ততটা পানি পান করাবেন না, এটি হতেই পারে না। এক ব্যক্তি তাঁর জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রাণাধিক বাসনা রাখে এবং নিজের সকল শক্তি ব্যয় করে আর নিজ সত্তার সকল শক্তি নিয়োজিত করে তাঁর পানে ছুটে– প্রশ্ন হলো, খোদা কি তার প্রতি করুণা করবেন না? তিনিকি তার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিবেন না? তার দোয়া কি গৃহীত হওয়ার যোগ্য নয়? তার আহাজারি কখনো কি খোদা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না? খোদা কি তাকে ব্যর্থতার মাঝে ধ্বংস করে দেবেন? সে কি সহস্র প্রকারের ব্যথা-বেদনা নিয়ে কবরে যাবে? আর খোদা কি তার চিকিৎসা করবেন না? সেই মহা সম্মানিত প্রভু কি তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন বা ছেড়ে দেবেন? খোদা কি স্বীয় সত্যবাদী ও অনুগত অনুসন্ধানীকে আপন নবীদের পথ দেখাবেন না? স্বীয় বিশেষ নিয়ামতে কি ধন্য করবেন না? নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয়, অনুসন্ধানীদের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। যারা তাঁর পানে ধাবিত হয়, তিনি তাদের প্রতি তাদের চেয়ে অধিক বেগে (আগ্রহে) সাগ্রহে ছুটে আসেন। যারা তাঁর নৈকট্য সন্ধান করে, তিনি তাদের অতি কাছে এসে যান, তিনি তাদের চোখ হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা দেখে, তিনি তাদের কান হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা শোনে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যাদের চোখ ও কান সেই অদৃশ্যে-জ্ঞাত সত্তা, (আল্লাহ্) এমন ব্যক্তি কি খোদা-প্রদত্ত জ্ঞানে বিশ্বাসের জ্যোতি পর্যন্ত পৌঁছুবে না? সে কি অনুমান বা ধারণার মাঝেই নিমজ্জিত থাকবে? তোমরা নিশ্চিত জেনো, সত্যবাদীদের জন্য তাঁর দরজাগুলো তাদের নিষ্ঠা অনুপাতে খুলে। তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই। তাঁর সত্তায় কোন কার্পণ্য নেই। তাঁর কৃপারাজির কোন শেষ নেই, আর তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতিরও কোন সীমা নেই। অবশ্য প্রথমে অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদরূপী নিয়ামত ও স্বর্গীয় নিশ্চিত জ্ঞানের ধনভাণ্ডার স্বীয় মনোনীত রসূলদেরকে প্রদান করেছেন, কিন্তু এরপর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ শিক্ষা প্রদান করে, সকল সত্যান্বেষীকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা তাদের প্রিয় রসূলের অনুসরণে সেই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, যা মূলত খোদার নবীদেরকে দেয়া হয়েছে। এই অর্থেই আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী আখ্যায়িত হন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তরাধিকার লাভ তাদের জন্য যদি সম্ভবই না হতো, তাহলে তারা কী করে উত্তরাধিকারী হলেন? মহানবী (সা.) কি বলেন নি যে, এই উম্মতে মুহাদ্দিস হবে আর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আন কবুত: ৭০) وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (সূরা ত্বাহা: ১১৫) এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, ঐশী জ্ঞানের ভিত্তি যদি সম্পূর্ণভাবে ধারণার ওপরই হয়ে থাকে, তাহলে এর নাম জ্ঞান কীভাবে হতে পারে? ধারণার কি এমন কোন গুরুত্ব আছে, যে কারণে একে জ্ঞান

করবেন, তা এমন নিদর্শন হবে, যা দেখে তোমরা শনাক্ত করতে পারবে আর খোদা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে উদাসীন নন। (সূরা আন নাহল: ৯৪)

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ
فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ

আমরা, তোমাদের প্রতি সেই রসূলসদৃশ এই রসূল প্রেরণ করেছি, যাকে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং ফেরাউন যখন এ রসূলের প্রতি অবাধ্য হলো, তখন তাকে আমরা এমন শাস্তির মাধ্যমে ধৃত করলাম, যার পরিণাম ছিল 'ওবাল' অর্থাৎ সেই শাস্তির ফলেই ফেরাউন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। (সূরা আল মুজাম্মিল: ১৬-১৮)

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

সুতরাং, তোমরা যারা ফেরাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছ, অবাধ্য হয়ে তোমরা কীভাবে রেহাই পেতে পার? তোমাদের অস্বীকারকারীরা কী ফেরাউনের দলবল থেকে উত্তম, নাকি ঐশী গ্রন্থে শাস্তি পাওয়া ও ধৃত হওয়া থেকে তোমাদেরকে নিরাপদ ও নির্দোষ আখ্যায়িত করা হয়েছে? এরা কি বলে যে, আমাদের জামা'ত বড় শক্তিশালী জামা'ত, যারা ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী? অচিরেই এই পুরো জামা'ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। (সূরা আল কামার: ৪৪-৪৬)

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ
قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

আর এই কাফিররা সর্বদা কোন না কোন লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতেই থাকবে, যতক্ষণ না সেই সময় এসে যায়, যার প্রতিশ্রুতি খোদা দিয়েছেন। খোদা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (সূরা আর রাদ: ৩২)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَٰلِبُونَ فَتَوَلَّ
عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

রসূলদের সম্পর্কে পূর্ব থেকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, সাহায্য ও বিজয় তাদেরই প্রাপ্য। আর আমাদের বাহিনীই সদা জয়যুক্ত থাকবে। সুতরাং যতক্ষণ সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হয়, তাদেরকে উপেক্ষা কর। তাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন কর আর অচিরেই তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। (সূরা আস সাফফাত: ১৭২-১৭৬)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰٓ
أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى الْمُرْسَلِينَ

আর তোমার পূর্বে যেসব নবী এসেছে, তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। আর দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদেরকে দুঃখ দেয়া হয়েছে, এমনকি এক পর্যায়ে আমাদের সাহায্য এসে গেছে। অতীতের রসূলদের সংবাদও তোমার কাছে এসে গেছে। (সূরা আল আন'আম: ৩৫)

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

---

**পাদটিকা-১ চলমান:** নাম দেয়া যেতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (সূরা আল কাহফ: ৬৬) এর কী অর্থ হবে? অতএব জানা উচিত যে, খোদার উক্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তা এবং অপরাপর শত শত পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, খোদা তা'লা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এই রসূলের আনুগত্যে বিলিনতার কারণে আর প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর অনুসরণ করার কল্যাণে এই রসূলের কল্যাণরাজি হতে অংশ দিয়ে থাকেন। এমন নয় যে, তিনি তাদের নিছক প্রাণহীন বৈরাগ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। আর কোন হৃদয়ে নবী (সা.) এর কল্যাণের প্রতিফলন ঘটলে অনুসরণীয় নবীর মত তারও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন হওয়া অবধারিত বিষয়। কেননা তাকে যে প্রস্রবণের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সংশয় ও সন্দেহের কলুষতা থেকে মুক্ত। আর রসূলের উত্তরাধিকারী হওয়ার পদটিও এ দাবিই করে যে, তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিশ্চিত ও অকাট্য হবে। কেননা তার কাছে কেবল কতগুলো ধারণাই যদি থেকে যায়, তাহলে সে নিজ দুর্বল বিষয়াদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির হিতসাধন কী করে করতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে সে পূর্ণ নয়, বরং অর্ধেক উত্তরাধিকারী হল, অর্থাৎ দুই চক্ষুর অধিকারী নয় বরং এক চোখ বিশিষ্ট হল। আর যে সমস্ত ভ্রষ্টতা নিরসনের জন্য খোদা তাকে দণ্ডায়মান করেছেন, সেসব ভ্রষ্টতার ভয়াবহতা, যুগের চরমভাবে রোগাক্রান্ত হওয়া, অস্বীকারকারীদের চরম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা, উদাসীনদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকা, বিরোধীদের ঘৃণ্যভাবে অস্বীকার করা এসবই জোর দাবি জানায় যে, এমন ব্যক্তির ঐশী জ্ঞান রসূলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আর এমন মানুষের নামই হাদীসে 'আমসাল' বা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কুরআনে 'সিদ্দীক' বা সত্যবাদী বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাদের যুগ পয়গম্বরদের আবির্ভাব-কালের সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে, অর্থাৎ যেভাবে পয়গম্বরগণ পৃথিবীতে ভয়াবহ ভ্রষ্টতা ও ঔদাসীন্যের বিস্তারকালে আসেন, অনুরূপভাবে এরাও তখন আসেন, যখন সর্বত্র ভ্রষ্টতার ভয়াবহ প্রাধান্য থাকে, সত্যের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করা হয়, মিথ্যার প্রশংসা করা হয়, মিথ্যাবাদীদেরকে সত্যবাদী আখ্যা দেয়া হয়, দাজ্জালদেরকে মাহ্‌দী মনে করা হয়, বস্তুজগত আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কাছে অত্যন্ত প্রিয় মনে হয়, যা হস্তগত করার জন্য তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে আর তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম তুচ্ছ ও সামান্য বিষয় পরিগণিত হয়। এমতাবস্থায় সে সমস্ত লোকই ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হয়ে থাকে যাদের প্রতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত এলহাম অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর যারা পূর্বে অতিবাহিত শ্রেষ্ঠ লোকদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকেন। সার কথা হল, নিশ্চিত ও সুদৃঢ় এলহাম এক বাস্তব সত্য বিষয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় এমন শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অস্তিত্ব প্রমাণিত সত্য আর এটি কেবল তাদেরই বিশেষত্ব। অবশ্য এটি সত্য কথা যে, রসূলদের এলহাম অতি উন্নত মানের, সমুজ্জ্বল, সবচেয়ে দীপ্তিমান, সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে স্বচ্ছ ও সুমহান বিশ্বাসের সবচেয়ে উন্নত মার্গে উপনীত আর সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যামান হয়ে থাকে যা সকল অমানিশা দূরীভূত করে। তবে ওলীদের এলহামগুলোর কোন একটি বাক্যের অর্থ যতক্ষণ অস্পষ্ট ও অজানা থেকে যায় ততক্ষণ তা আনুমানিক বিষয়ই রয়ে যায়। ওলীর এলহাম কেবল তখনই নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার গণ্ডিভুক্ত হবে, যখন তা দুর্বল এলহামের শ্রেণিভুক্ত হবে না বরং বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়ে স্বীয় পূর্ণ জ্যোতি দৃঢ়ভাবে বিচ্ছুরিত করে এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়কে পূর্ণ বিশ্বাসে ভরে দেবে। বিভিন্ন বাক্যে ও শব্দে অবতীর্ণ হয়ে অর্থ ও ভাব পুরোপুরি খোলাসা করবে আর বাক্যকে অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতার গণ্ডি থেকে বাইরে নিয়ে আসবে। লাগাতার দোয়া ও যাচনার সময় স্বয়ং খোদা তা'লা দোয়া কবুল করে ও অবিরাম ধারায় উত্তর প্রদানের মাধ্যমে সে সমস্ত অর্থ যে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় তা পুরো স্পষ্টতার সাথে বর্ণনা করেন। কোন এলহাম যদি এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তাহলে তা দীপ্তিতে পরিপূর্ণ আর সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ়। যারা বলে যে, মূলের দিক থেকে ওলীদের এলহামের নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই, তারা পূর্ণ মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ও রিক্তহস্ত। (চলবে)

# জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

## "মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা-কাজ-বাক্য ও উপদেশে প্রজ্ঞা নিহিত আছে"

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ আমি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী থেকে সবচেয়ে বেশি অংশ লাভকারী অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন এবং আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর সেই সত্যিকার বিকাশ যার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লার রঙ আর কেউ ধারণ করতে পারে না, অর্থাৎ হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর 'হাকীম' বৈশিষ্ট্যের আলোকে বর্ণনা করবো। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রিয়ভাজন, তাঁকে সৃষ্টির লক্ষ্যেই আকাশ ও পৃথিবীমালা বানিয়েছেন। যাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারা রহমত প্রেরণ করেন। তাই তাঁর মোকাম ও আশিসমন্ডিত কথামালার এমনই গুরুত্ব যার প্রতি একজন মু'মিনের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত: আত্মিক পরিশুদ্ধির

জন্য এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা ও কথা যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা তাঁর (সা.) মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যেভাবে আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য এক রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায় এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে আর তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা পূর্বে যা জানতে না তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়।"

দ্বিতীয়তঃ তাঁর (সা.) নির্দেশ, কথা, কাজ ও উপদেশ যা দৈনন্দিন জীবন থেকে আরম্ভ করে জাতীয় কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, যাতে তাঁর (সা.) প্রতিটি কথা-কাজ-বাক্য ও উপদেশে প্রজ্ঞা নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিটি কথা-কাজ ও উপদেশ পবিত্র কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ এর ব্যাখ্যারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে প্রজ্ঞাপূর্ণ বানানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ সর্বোত্তম আদর্শকে আবির্ভূত করেছেন। তিনিই যার পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় সমৃদ্ধ হতে পারবো। "ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিনা" বলে আল্লাহ্ তা'লা এ কথার সত্যায়ন করেছেন, তোমাদের পবিত্র করার জন্য আর তোমাদের মঙ্গলার্থে এ নবী তোমাদেরকে যা কিছু শুনাবে তা অথবা আমাদের মূল বাক্য যা তোমাদের শুনানো হচ্ছে অথবা এর ব্যাখ্যা। এজন্য এ নবীর কোন কথাই এমন নয় যাকে তোমরা প্রজ্ঞাহীন বা উদ্দেশ্য বিবর্জিত মনে করতে পারো। আর এ নবী তোমাদেরকে কেবল এরূপ বা ওরূপ করার নির্দেশই দেয় না বা উপদেশ দেন না বরং ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করেন। তাই খোদা তা'লা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, সেই সর্বোত্তম আদর্শের ওপর অনুশীলন করো যা আল্লাহ্ তা'লার এ প্রিয় নবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই প্রত্যেক মু'মিনকে মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা বুঝা উচিৎ আর এ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি সুস্পষ্টভাবে না-ও বুঝা যায় তাহলে কমপক্ষে এ বিশ্বাস যেন থাকে, নিশ্চয়

**"অনেক সময় খুব সামান্য বিষয়ও অন্যের জন্য হোঁচটের কারণ হয়ে থাকে, তাই এমন পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করে সন্দেহ দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিৎ, যাতে অন্যরা হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং ঈমানকে বিনষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করে।"**

এতে কোন প্রজ্ঞা রয়েছে আর আমাদেরই উপকারার্থে। এরূপ চিন্তা-ভাবনাই একজন মু'মিনের চিহ্ন হওয়া উচিৎ, মু'মিনের মাঝে থাকা উচিৎ।

এবার আমি মহানবী (সা.)-এর কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি, যাতে বিভিন্ন নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি (সা.) আমাদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম এ হাদীসটি পেশ করছি। একটি হাদীসে তিনি (সা.) বলেন 'আল্‌কালিমাতুল্ হিকমাতু যাল্লাতুল মু'মিনি হাইসু মা ওয়াজাদাহা ফাহুয়া আহাক্কু বিহা' (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয্‌যুহদে, বাবুল হিকমাহ্)। হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন সেই এর বেশি হকদার।

এখানে যা স্পষ্ট করা হয়েছে তাহলো, প্রজ্ঞার কথা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন যদি বিধর্মীদের কাছেও পাওয়া যায়, দরিদ্র, শিশু বা তোমাদের বিবেচনায় কোন অজ্ঞ বা কম শিক্ষিতের কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু মনে রেখ! কি ধরনের কথা? যদি প্রজ্ঞা হয় তাহলে তা গ্রহণ করো, কেননা তোমরা এর হকদার। অহংকার বশতঃ একে উপেক্ষা করো না অথবা এটি মনে করো না যে, আমি যা জানি তাই যথেষ্ট। বরং চিন্তা করে একে গ্রহণ করো।

এবার দেখুন! একটি শিশুর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা যা সে একজন প্রবীণকে বলেছিল। ঘটনাটি এমন; বৃষ্টির মধ্যে একটি শিশু পথ চলছিল তা দেখে একজন বর্ষিয়ান বললো, বালক দেখে শুনে পথ চলো যাতে পা পিছলে না পড়ো। শিশুটি বললো, যদি আমি পড়ে যাই, তাহলে আমি কেবল ব্যাথা পাবো কিন্তু আপনিতো জাতির নেতা, আধ্যাত্মিক পথিকৃত। যদি আপনি পড়ে যান তাহলে পুরো জাতির পতনের আশংকা আছে, প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা আছে। যদিও একটি শিশুর মুখ থেকে বেড়িয়েছে কিন্তু অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা।

দ্বিতীয়তঃ এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, একজন মু'মিনকে অনর্থক কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থেকে প্রজ্ঞার সন্ধানে থাকা উচিৎ। যদি এ চেতনার সাথে আমরা জীবন-যাপন করি তাহলে অনেক বেহুদা ও অনর্থক বিষয় থেকে আমরা রক্ষা পাবো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, দু'জনকে ঈর্ষা করা বৈধ। এক সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন আর তিনি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেন। আরেকজন তিনি যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছেন আর সে এর মাধ্যমে মিমাংসা করেন এবং মানুষকে শিক্ষা দেন। (সহীহ্ বুখারী,

বাবুল ইঘতিবাত ফীল্ ইলমুল হিকমাহ্)

এখানে মু'মিনদের ওপর প্রজ্ঞা বিস্তার করার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। জ্ঞান অর্জন করো তারপর নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তা ছড়িয়ে দাও। যদি কোন প্রজ্ঞাপূর্ণ বা জ্ঞানের কথা পাও তাহলে মু'মিনের কাজ একে অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া, যাতে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন সভা যেখানে হিকমতপূর্ণ কথা-বার্তা হয় মহানবী (সা.) তাকে 'নে'য়মুল মজলিস' নেয়ামতপূর্ণ বৈঠক) বলেছেন।

আওন বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'কতইনা উত্তম সে বৈঠক যাতে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার বিস্তার দেয়া হয়।' এটি সরাসরি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত নয়, কিন্তু তিনি এটি শুনেছেন এবং বলেছেন, 'কতইনা উত্তম সে বৈঠক যাতে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার বিস্তার দেয়া হয় আর রহমতের প্রত্যাশা করা হয়।' (সুনানুত্ দারমী-বাব মিন হাবাল্ ফিতইয়া মাফাখাতু)

আমাদের বৈঠকাদীর মানও এরূপই হওয়া উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এমনটিই, অনর্থক বৈঠক বর্জন করবে। এমন সভাও ত্যাগ করো যেখানে ধর্মের বিরুদ্ধে কথাবার্তা হয়। ধর্মের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র হয়।

খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে বেহুদা আলোচনা হয়। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে এদের বুঝানোর উদ্দেশ্যে আর এ নিয়্যতে যাতে কতক মানুষের মঙ্গল হয় অথবা যারা জ্ঞানী তারা এদের বুঝানোর জন্য যদি এ ধরনের সভায় অংশ নেয় তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি দেখো, এরা হাশি ঠাট্টাই করছে, বুঝতে চায় না তাহলে এমন বৈঠক থেকে উঠে যাবার নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। কেননা এমন মজলিসের ওপর ফিরিশতা অভিসম্পাত বর্ষণ করে। একজন মু'মিনের এমন বৈঠক সন্ধান করা উচিৎ যেখানে প্রজ্ঞার আলোচনা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার জন্য দু'বার এ দোয়া করেছেন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেন। (সূনানুত্ তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব বাব মানকিব আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস) তাঁর (সা.) কাছে এর এত বেশি গুরুত্ব ছিল। অথবা এত বড় উপহার ছিল ফলে তিনি দোয়া করেছেন।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর আরেকটি ঘটনা যা যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) সেসব যুদ্ধবন্দীদেরকে যারা পড়াশুনা জানতো তাদেরকে সুযোগ দেয়া হলো, যদি তারা আনসারদের দশটি শিশুকে পড়ালেখা শিখায় তাহলে মুক্তি পাবে। তারপর যখন সে শিশুরা পড়ালেখা শিখেছে তখন সেসব যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। (তাবাকাতুল ইবনে সা'দ, ২য় খন্ড-পৃষ্ঠা.২৬০) তাঁর দৃষ্টিতে এমনই জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল।

হিকমত এর একটি অর্থ ইলম বা জ্ঞান। কেননা জ্ঞান মননশীলতাকে প্রদীপ্ত করে। অজ্ঞতা দূর করে। মহানবী (সা.) প্রজ্ঞার আলোকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি মানুষের মেধা বিকশিত হয় তাহলে উত্তমভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবে। যদি তাঁর মাথায় এটি থাকতো যা আজ তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীরা বলে, তিনি তরবারীর জোরে পুরো বিশ্বকে অধীন করতে চাইতেন, নাউযুবিল্লাহ্।

তাহলে এমন নির্দেশ তিনি কখনই দিতেন না, যে এতগুলো শিশুকে পড়ালেখা শিখাবে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। বরং একথা বলতেন, যে জরিমানা আদায় করে মুক্ত হতে পারছে না যদি সে বন্দী যুদ্ধের কলা-কৌশলে দক্ষ হয় তাহলে তা শিখিয়ে মুক্ত হতে পারবে। বরং তিনি (সা.) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি তাঁর উম্মতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, আজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই আমাদের সফলতার মাধ্যম। তবলীগের জন্য এমন মাধ্যম ব্যবহার করুন যা প্রজ্ঞাপূর্ণ। তাই জ্ঞান আহোরণের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা চাই। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।

যেভাবে বলা হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

(সূরা আন্ নাহল: ১২৬) তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করো এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করো যা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে; এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

তাই প্রচারকদেরকে স্থান-কাল ভেদে প্রজ্ঞার সাথে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কেও যেন সঠিক জ্ঞান থাকে যাতে যথাযথ দলীল দ্বারা উত্তর দেয়া যায় আর কেবল শুষ্ক দলীল ও ঝগড়া-বিবাদে জড়াবে না। মু'মিন প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী আর জ্ঞানের পাশাপাশি এগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, প্রতিপক্ষের মধ্যে যদি গোয়ার্তুমি লক্ষ করো তাহলে সে বৈঠক পরিত্যাগ করাতে প্রজ্ঞা নিহিত আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এমনই যদি অন্য পক্ষ্য দলীল-প্রমাণ ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত নয় তাহলে বিতর্ক সেখানেই বন্ধ করে দাও, আর তবলীগের ক্ষেত্রে এমন রীতিই অন্যের হৃদয়কে কোমল করে এবং কথা শোনার কারণ হয় আর হবে। এরপরে হেদায়াত কে পাবে আর কে পাবে না তা আল্লাহ্ ভালো জানেন। প্রজ্ঞার সাথে বাণী পৌঁছাতে থাকা আমাদের দায়িত্ব।

একটি হাদীসে এসেছে, যা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা কয়েকবার পাঠ করেছি, আপনারাও শুনেছেন। হযরত আলী বিন হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত সাফিয়া (রা.) বলেছেন, তিনি একদা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান তখন তিনি (সা.) রমযানের শেষ দশকে মসজিদে এতেকাফে বসেছিলেন। রাতের বেলা

**“আহমদীদের ওপর যেসব যুলুম-নির্যাতন হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্ আর বেশি সময় ধরে চলবে না। বিজয় আমাদের, আর নিশ্চয় আমরাই সফল হবো।”**

অনেক সময় কতাবার্তা বলে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আসেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর হুজরার সাথে লাগানো দরজা পর্যন্ত যখন তিনি (সা.) পৌঁছেন তখন আনসারদের দু'ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে যান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সালাম করে দ্রুত প্রস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, দাঁড়াও। ইনি সাফিয়া বিনতে হুইয়ি। তারা দু'জন বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সুবহানাল্লাহ্! এবং এ বিষয়টি তাদের দু'জনকে ভীত করে ফেলে। তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় শয়তান মানব শরীরে রক্তের ন্যায় বিচরণ করে আর আমি ভয় করি, তোমাদের মনে আবার মন্দ ধারণা না সৃষ্টি করে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবুত্ তকবীর ও তসবীহ্ ইনদাল্ তায়াজ্জুব)

দেখুন কুধারণা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এটি একটি শিক্ষা, অন্যকে যে কোন প্রকারের হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিৎ। যদি কেউ একান্তই দূর্ভাগা হয় যে কুধারণার ওপর জিদ করে তাহলে ভিন্ন কথা অন্যথায় সবাইকে অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিৎ। বিশেষভাবে কর্মকর্তাদেরকে এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, কোন অবস্থাতেই এমন কিছু যেন না ঘটে যা অন্যের জন্য হোঁচট খাবার কারণ হয়। আবশ্যক নয় যে, কেবল বড় বড় বিষয়টি হোঁচটের কারণ হয় অনেক ক্ষেত্রে খুব সামান্য বিষয়ও অন্যের জন্য হোঁচটের কারণ হয়, তাই এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করে অন্যের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা উচিৎ যাতে অন্যরা হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা পায় আর স্বীয় ঈমানকে বিনষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা করে।

অপরের ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ

(সূরা আন্ নূর: ২৮) অর্থাৎ তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম করো। এটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উন্নত নৈতিক গুণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করানোর নির্দেশ।

একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাহ্‌ল বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুযূর (সা.)-এর ঘরের ছিদ্র দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছিল যখন নবী করীম (সা.) চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। তিনি (সা.) বলেন, যদি আমি জানতে পারতাম যে, তুমি উঁকি ঝুঁকি মারছো তাহলে আমি এ চিরুনি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। তারপর বলেন, দেখার কারণেই অনুমতি সাপেক্ষে গৃহে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুদ্ দিয়াত, বাব মিন ইত্তেলা ফী বাইত কওমু ফাফকুনু) যে উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি (সা.) এসেছেন আর যে প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা প্রসার করার লক্ষ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, কেই তা থেকে সামান্য বিচ্যুত হোক তা মহানবী (সা.) মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই উঁকি ঝুঁকিকারীর কান মলে দেন এবং শক্ত ভাষায় তাকে সাবধান করেন, যদি আমি জানতে পারতাম তাহলে এ চিরুনি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম।

তারপর আল্লাহ্ তা'লার আরেকটি নির্দেশ, মু'মিনরা যেন তাঁর প্রতি ভরসা রাখে। কিন্তু অনেকে একে ভুল বুঝে আর যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন তা ব্যবহার করেন না আর এভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে একবার ঘটেছে, উপরকরণ ব্যবহার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়। কেননা এটি প্রজ্ঞাহীন কথা। উপকরণও যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন তাই তার ব্যবহারও আবশ্যক। যখন এধরণের এক প্রশ্নকর্তা মহানবী (সা.)-এর কাছে এ প্রশ্ন করেন, আমি কি উটের হাটু বেঁধে খোদার ওপর ভরসা করবো না কি উটকে খোলা ছেড়ে দিয়ে খোদার ওপর ভরসা করবো? উত্তরে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন. 'আ'ক্বিলহা ওয়া তাওয়াক্কাল' উটের হাটু বেঁধে তারপর ভরসা করো। (সূনানুত তিরমিযী, কিতাবুসইসফ্‌ফাতুল কিয়ামাহ্ ওয়াররাকায়েক)

তারপর জাতীয় বিষয়াদীতেও তিনি (সা.) প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন। উহুদের যুদ্ধের কথা সবাই জানেন, মহানবী (সা.)-এর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত না মানার কারণে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হন আর স্বয়ং মহানবী (সা.)-ও শারীরিক ক্ষতির শিকার ও আহত হন, দাঁত শহীদ হয়। যুদ্ধের পরে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল যদিও তাকে পরাজয় বলা যায় না কিন্তু জয়

পেতে পেতে অবস্থা পাল্টে যায়। যাই হোক যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন ক্লান্তি ও আহত হবার কারণে মুসলমানদের অবস্থা খুবই করুণ ছিল। উহুদের যুদ্ধের পরের দিন যখন রসূল করীম (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে মদিনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তখন মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, মক্কার কাফেররা পুনরায় মদিনার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেননা কতক কুরায়শ একে অপরকে এ বলে খোঁটা দিচ্ছিল, না তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছ (নাউযুবিল্লাহ্) আর নাই মুসলমান মেয়েদেরকে দাসী বানাতে পেরেছ এবং না তাদের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করতে পেরেছ। ফলে মহানবী (সা.) তাদের পিছু ধাওয়া করার সিদ্ধান্ত নেন। 'হুযূর (সা.) একথা ঘোষণা করেন, আমরা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করবো আর এ পিছু ধাওয়া করার জন্য আমার সাথে কেবল সেসব সাহাবী সঙ্গী হবেন যারা গতকাল উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।' (আত্তাবাকাতুল কুবরা ইনবে সায়াদ, ২য় খন্ড-পৃষ্ঠা.২৭৪, আল্ আসাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুদ্ধ)

মুসলমানদের সাহস ধরে রাখার জন্য এটি ছিল তাঁর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তারা যারা যুদ্ধ থেকে ফিরেছে, প্রায় পরাজিত অবস্থা ছিল, তারা যেন নিরাশ না হয়। তাদের উৎসাহে যেন ভাটা না পরে আর শত্রুদের ওপর প্রতাপ সৃষ্টি করে, এটি মনে করো না যে, তোমরা বিজয় লাভ করেছ বরং এটিতো সামান্য অবস্থার পরিবর্তন ছিল মাত্র। বস্তুতঃ এমনই হয়েছে। যখন এরা পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করে তখন শত্রুদের পিছু ফিরে দেখার বা আক্রমণ করার সাহস হয়নি, তারা চলে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা কেন গোটা বিশ্বকে নের্তৃত্ব ও শাসন করার জন্য তাঁকে (সা.) আবির্ভূত করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা নবুয়তের যুগ আরম্ভ হবার পূর্বেই প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রজ্ঞাবান খোদা তাঁকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাই নবুয়তের পূর্বেও তিনি (সা.) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন মানুষ তা অত্যন্ত পছন্দ করতো। এর মধ্যে কাবা পুনঃনির্মাণের ঘটনা রয়েছে। এর উল্লেখ এসেছে, হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় আর যুদ্ধ বাঁধার উপক্রম হয়। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত এর কোন সমাধান পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। 'একদিন কুরায়শরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করেন, তখন কুরাশদের সবচেয়ে প্রবীন ব্যক্তিত্ব আবু ইমাইয়াহ্ বিন মুগীরাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমুর বিন মাকতুম বলেন, হে কুরায়শ! তোমরা সবাই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নাও যে, তোমাদের এসমস্যার সমাধান করবে সে ব্যক্তি যে কাল প্রত্যূষে সর্বপ্রথম বাইতুল্লাহ্'তে আসবে।

সুতরাং তারা এ পরাপর্শ মেনে নেয় আর পরের দিন তারা সর্বপ্রথম কাবায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পদার্পণ করতে দেখেছে। তারা তাঁকে (সা.) দেখতে পেয়ে বললো 'আমীন' এসে গেছে। আমরা আনন্দিত। ইনি মুহাম্মদ (সা.)। তারপর তারা সবাই তাঁর কাছে গিয়ে কুরায়শদের সমস্যার কথা খুলে বললে তিনি (সা.) বলেন, একটি চাঁদর আনো; যখন কাপড় নিয়ে আসা হলো তিনি (সা.) তা বিছান এবং হাজরে আসওয়াদকে তুলে এনে চাঁদরের ওপর রাখেন। তারপর তিনি প্রত্যেক গোত্রের প্রধানকে বলেন, এ চাঁদরের কোন ধর তারপর সবাই মিলে একে তুলে নিয়ে তা স্থাপনের জায়গায় নিয়ে যাও। তারা সবাই এমনটিই করে তারপর তিনি (সা.) হাজরে আসওয়াদকে উঠিয়ে তার নির্ধারিত স্থানে রাখেন।' তিনি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেন যা সেসব গোত্রকে হত্যা ও খুনাখুনির হাত থেকে রক্ষা করে। একবার তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হলে তা বছরের পর বছর চলতে থাকতো। জানি না কত লোক নিহত হতো আর কতদিনই বা এ যুদ্ধ চলতে থাকতো।

খোদা তা'লা তাঁকে (সা.) কত বেশি প্রজ্ঞা শিখিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনায় এসেছে, 'হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু যার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি মক্কায় ছিলাম তখন আমার ঘরের ছাদ উম্মুক্ত হয় আর সেখান দিয়ে জিব্রাইল (আ.) অবতীর্ণ হন। তিনি আমার বক্ষ উম্মুক্ত করেন তারপর জমজমের পানি দিয়ে তা ধৌত করেন। তারপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ সোনার একটি থালা নিয়ে আসেন এবং আমার বক্ষে ঢেলে দেন আর আমার বক্ষ বন্ধ করে দেন। তারপর আমার হাত ধরে আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে যান।' (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাব কাইফা ফরযাতুসসালাতু ফীলইসরা)

হিমাম বিন যায়দ বিন আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি। একবার একজন ইহুদী মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে যায় আর সে আস্‌সামু আলাইকুম বলে অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও। তিনি (সা.)-এর উত্তরে বলেন আলাইকুম, তোমার ওপরও। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের সম্বোধণ করে বলেন, সে কি বলেছে তা তোমরা জান? তারপর তিনি (সা.) বলেন, সে আস্‌সামু আলাইকুম বলেছিল। সাহাবী (রা.) ইহুদীদের এমন অপকর্ম দেখে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাদেরকে ওকে হত্যা করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, না। তাকে হত্য করবে না, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যে কেউ তোমাদেরকে সালাম করবে তোমরা তাদেরকে ওয়ালাইকুম বলে উত্তর দিবে।' (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ইসতিতাবাতুল মুরতাদীন ওয়া ক্বাতালাহুম, বাব ইযা আরযুয্‌যমী ওয়া গইরাহু বাসাবান্ নবী, ওয়ালাম ইয়াসরিহ্ নাহু ক্বওলুহুস্ সামু আলাইকুম) ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও আর বিতর্ক থেকে বাঁচো।

সাঈদ বিন আবি সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-কে একথা বলতে শুনেছেন; রসূল করীম (সা.) নজদ অভিমুখে যুদ্ধ অভিযান প্রেরণ করেন আর তারা বনু হানিফার এক ব্যক্তি সুমামাহ্ বিন আসাল'কে বন্দী করে নিয়ে আসেন। সাহাবীরা তাকে মসজিদে নববীর পিলারের সাথে বেঁধে রাখেন। মহানবী (সা.) তার কাছে এসে বলেন, হে সুমামাহ্! তোমার কাছে কি অজুহাত আছে বা তোমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে বলে তুমি মনে কর। সে বললো আমার সুধারণা রয়েছে। যদি আপনি

(সা.) আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন যে এর মূল্যায়ন করতে জানে। কিন্তু যদি আপনি (সা.) সম্পদ চান তাহলে যত ইচ্ছে নিয়ে নিন। এভাবেই পরের দিবস উদয় হয়। তিনি (সা.) আবারো আসেন এবং সুমামাহ্'কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সংকল্প কি? সুমামাহ্ বলে আমিতো গতকালই আপনার সমীপে নিবদেন করেছি, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন যে এ অনুগ্রহের মূল্যায়ন করতে জানে। তিনি এখানেই কথা বন্ধ করেন আর পরের দিন সূর্য উদয়ের পর পুনরায় বলেন, হে সুমামাহ্ তোমার নিয়্যত কি? সে বললো, আমার যা কিছু বলার ছিলো তা বলেছি।

তিনি (সা.) বলেন, একে মুক্ত করে দাও। সুমামাহ্ মসজিদের কাছে খেজুর বাগানে যায়, গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে কলেমা শাহাদত পাঠ করে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! খোদার কসম পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ ছিল আপনার চেহারা আর বর্তমান অবস্থা এমন যে, আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে আপনার চেহারা। খোদার কসম পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ ছিল আপনার ধর্ম আর বর্তমান অবস্থায় আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হচ্ছে আপনার আনিত ধর্ম। খোদার কসম! পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতাম আপনার শহরকে আর এখন এ শহরই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার (সা.) ঘোড় সওয়ারীরা তখন আমাকে ধরেছে যখন আমি উমরাহ্ করতে চাচ্ছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশনা কি? রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে শুভসংবাদ দেন আর তাকে উমরাহ্ করার নির্দেশ দেন। যখন তিনি মক্কায় পৌঁছেন তখন কেই বললো, তুমি কি সাবী হয়ে গেছো? উত্তরে সে বললো, না আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি।' (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব বনী হুনায়ফাহ্ ওয়া হাদীস সুমামাহ্ বিন আসাল)

তিনি (সা.) তিন দিন পর্যন্ত তাকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেন যাতে সে মুসলমানদের ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি ও নিষ্ঠা এবং আপন প্রভুর সমীপে কিভাবে অনুনয় বিনয় করে তা দেখতে পায়। এবং মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি কিভাবে ভালোবাসা ও প্রীতি প্রকাশ করে আর তিনি (সা.) তাঁর মান্যকারীদেরকে কি শিক্ষা প্রদান করেন। সরাসরি কোন তবলীগ করেন নি। কেবল প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার সংকল্প কি? যাতে বুঝতে পারেন এর ওপর কোন প্রভাব পড়েছে কি না; এবং তৃতীয় দিন তাঁর দিব্য শক্তি বুঝতে পেরেছে যে, এখন এর মধ্যে কোমলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই কোন অঙ্গীকার ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দেন তারপর যে ফলাফল সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ তার ইসলাম গ্রহণ প্রমাণ করে যে, তাঁর (সা.) ধারণা সঠিক ছিল।

তারপর হুদায়বিয়ার সন্ধির আরেকটি ঘটনা। বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার আলোকে তিনি (সা.) যে কাজ করেছেন তার প্রভাব পড়েছে একজন কুরাইশ নেতার ওপর। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উরওয়াহ্ বিন মাসউদ ফিরে গিয়ে কুরায়শদের বললো (হযরত মিয়া বশির আহমদ সাহেব তাঁর পুস্তক সিরাত খাতামুল আম্বিয়া'তে নিজের মত করে বর্ণনা করেছেন) হে লোক সকল! আমি পৃথিবীতে অনেক ঘুরেছি। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের দরবারে যোগদান করেছি, কায়সার ও কিসরার দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি কিন্তু খোদার কসম! যেভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবাদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্মান করতে দেখেছি সেভাবে আমি অন্য কোথাও দেখিনি। উরওয়াহ্র এ কথা শুনে বনু কেনানাহ্ গোত্রের হুলাইস বিন আল্‌কিমাহ্ নামী একজন নেতা কুরায়শদের সম্বোধন করে বললো, যদি আপনারা পছন্দ করেন তাহলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাবো। তারা বললো যাও দেখো গিয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারো কি না?

তারপর এ ব্যক্তি হুদায়বিয়াহ্তে আসে এবং মহানবী (সা.) তাকে দূর থেকে আসতে দেখে সাহাবাদের বলেন, এ ব্যক্তি যে আমাদের দিকে আসছে সে এমন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে যারা কুরবানীর দৃশ্য পছন্দ করে। দ্রুত তিনি এ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেন এবং নির্দেশ দেন, (কেননা তিনি {সা.} যুদ্ধ বিগ্রহ পছন্দ করতেন না আর তিনি যেখানে যুদ্ধ করতেও যান নি বরং শান্তিপূর্ণভাবে হজ্জ করতে চাচ্ছিলেন) তিনি (সা.) বলেন, তাড়াতাড়ি তোমাদের কুরবানীর পশুদের জড়ো করো এবং সামনে নিয়ে আস যাতে সে বুঝতে পারে আর অনুভব করে যে, আমরা কি উদ্দেশ্যে এসেছি। তারপর সাহাবারা (রা.) উচ্চস্বরে তকবীর দিতে দিতে তাদের কুরবানীর পশুদের হাঁকিয়ে সম্মুখে সমবেত হন, কেননা তিনি (সা.) বলেছিলেন এ ব্যক্তি যে গোত্রের মানুষ তারা কুরবানীর দৃশ্য খুবই পছন্দ করে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করেন যাতে তার পছন্দ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক অনুশীলন করা হয়। সাহাবীরা (রা.) উচ্চস্বরে তকবীর দিতে দিতে তাদের কুরবানীর পশুগুলোকে হাঁকিয়ে তার সম্মুখে একত্রিত করেন। তিনি এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ্- সুবহানাল্লাহ্ এরাতো হাজী তাদেরকে বাইতুল্লাহ্র তওয়াফ করা থেকে কিভাবে বাঁধা দেয়া যেতে পারে। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফিরে গিয়ে কুরায়শদের বলতে থাকে, আমি মুসলমানদেরকে তাদের পশুর গলায় কুরবানীর মালা পড়ানো অবস্থায় দেখেছি এবং তাদের ওপর কুরবানীর চিহ্ন লাগানো দেখেছি। তাদেরকে ক্বাবা তওয়াফ করা থেকে বিরত রাখা কোনভাবেই সমিচীন হবে না। কিন্তু তখন যেহেতু কাফের এবং কুরায়শদের ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, একপক্ষ অনুমতি দিতে চাচ্ছিল কিন্তু অন্যপক্ষ দিতে চাচ্ছিল না; তাই সেবছর হজ্জ না করতে দেয়ারই সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা এর পরিনাম শুভ করেছিলেন। (সিরাত খাতামান্ নবীঈন এর তৃতীয় খন্ডের ৭৫৮ পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহীত)

তারপর মক্কা বিজয়ের সময় আবু সূফিয়ানের একটি ঘটনাও ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ

(রা.) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যখন আবু সূফিয়ানকে গ্রেফতার করে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, বলো কি চাও? সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আপনি কি আপনার জাতির প্রতি দয়া করবেন না। আপনিতো পরম দয়ালু ও মহানুভব এছাড়া আমি আপনার আত্মীয়ও বটে, ভাই হই তাই আমাকে সম্মান দেখানোও প্রয়োজন, কেননা, এখন আমি মুসলমান হয়ে গেছি। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যাও মক্কাতে ঘোষণা করে দাও; যে ব্যক্তি আবু সূফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল আমার ঘরে আর কতজনের সংকুলান হবে। এতবড় শহর তা আমার গৃহে আর কতজন আশ্রয় নিতে পারবে। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে; যে ব্যক্তি খানা ক্বাবায় আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। আবু সূফিয়ান বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! খানা ক্বাবাও ছোট্ট একটি জায়গা সেখানেইবা কতজন আশ্রয় নিবে তারপরও লোক বাকী থেকে যাবে।

তিনি (সা.) বলেন, যে নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ রাখবে তাকেও নিরাপত্তা দেয়া হবে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যারা রাস্তা-ঘাটে বসবাস করে তারা কোথায় যাবে? তিনি (সা.) বলেন ঠিক আছে; তারপর তিনি একটি পতাকা বানান এবং বলেন, এটি বেলাল (রা.)-এর পতাকা। আবি রওয়াইহাহ্ নামী একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি (সা.) যখন মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ছিলেন এবং পরস্পরকে ভাই-ভাই বানাচ্ছিলেন তখন আবি রওয়াইহাহ্‌কে বেলালের ভাই বানিয়েছিলেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন, এটি তাঁর ব্যক্তিগত মত সম্ভবত সে সময় বেলাল (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না অথবা অন্য কোন প্রজ্ঞা ছিল, যাই হোক তিনি বেলাল (রা.)-র জন্য পতাকা বানান এবং আনসার আবি রওয়াইহাহ্'র হাতে সোপর্দ করে বলেন, এটি বেলাল (রা.)'র পতাকা। তাকে সাথে নিয়ে এ পতাকাসহ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করো, যে এ পতাকার নীচে এসে দাঁড়াবে, পতাকার নীচে আশ্রয় নিবে তাকেও প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে। আবু সূফিয়ান বললো, ঠিক আছে এবার যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে গিয়ে ঘোষণা করার অনুমতি দিন।

যেহেতু মক্কার কুরাইশ নেতারাই অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তাই ভয় পাবার কোনই কারণ ছিল না। সে মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করেন, নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখো আর কেউ বাইরে এসো না। খানা ক্বাবায় চলে যাও এবং বেলাল (রা.)'র পতাকা যারা এর নীচে আশ্রয় নিবে তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদের সবার প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে এবং কিছুই বলা হবে না। কিন্তু তোমাদের অস্ত্র সমর্পণ কর ফলে মানুষ তাদের অস্ত্র সমর্পণ করা আরম্ভ করে আর হযরত বেলাল (রা.)'র পতাকা তলে সমবতে হতে আরম্ভ করে।

এ ঘটনা থেকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, এতে সবচেয়ে মহান বিষয়টি হলো হযরত বেলাল (রা.)'র পতাকা। রসূলে করীম (সা.) বেলাল (রা.)-এর জন্য পতাকা বানান এবং বলেন, যে ব্যক্তি বেলাল (রা.)-এর পতাকার নীচে আশ্রয় নিবে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে অথচ নেতা ছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। কিন্তু মহানবী (সা.) নিজের কোন পতাকা উত্তোলন করেন নি। তারপর কুরবানীর দিক থেকে সম্মুখ সাড়িতে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) কিন্তু কারো নামেই পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। এরপরে খালেদ বিন ওলিদ ছিলেন, তিনি এবং সর্দার ছিলেন অথচ সেখানে কারোরই পতাকা বানানো হয় নি। মহানবী (সা.) কেবল বেলাল (রা.)-এরই পতাকা বানিয়েছিলেন।

(হযরত মুসলেহ্ মাওউদ {রা.}) বলেন যে, এ কারণে বানিয়েছিলেন। কারণ হলো, খানা ক্বাবার ওপর যে আক্রমন হতে যাচ্ছিল, আবু বকর (রা.) দেখছিলেন; যাদেরকে মারা হবে তারা তাদেরই ভাই-বন্ধু। তিনি স্বয়ং বলে ফেলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি আপনার ভাইদেরকে হত্যা করবেন? তিনি মুসলমানদের ওপর কৃত সেসব অত্যাচার-নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) ও বাহ্যত মহানবী (সা.)-এর খিদমতে একথাই নিবেদন করেছিলেন, এসব কাফেরদেরকে হত্যা করুন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিন কিন্তু মনে মনে হয়তো বলছিলেন, এরা আমাদেরই ভাই। যদি ক্ষমা করা হয় তাহলে উত্তম। অনুরূপভাবে হযরত উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) বা অন্যান্য যেসব সর্দার ছিলেন কোন না কোন ভাবে সবারই আত্মীয়তা বা সহানুভূতি ছিল মক্কাবাসীদের প্রতি। কেবল এক ব্যক্তি ছিলেন মক্কায় যার কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। মক্কায় যার কোন শক্তি ছিল না। মক্কায় যার কোন সঙ্গী ছিল না এবং নিসঙ্গ অবস্থায় তার ওপর যে নির্যাতন করা হয়েছে তা না আবু বকরের (রা.) ওপর হয়েছে, না হযরত উমরের(রা.) ওপর হয়েছে, না হযরত আলীর (রা.) ওপর হয়েছে, না হযরত উসমানের (রা.) ওপর হয়েছে আর নাই মহানবী (সা.)-এর ওপর হয়েছে।

মক্কায় জলন্ত ও উত্তপ্ত বালুর ওপর হযরত বেলাল (রা.)-কে উলঙ্গ শুইয়ে দেয়া হতো। তাঁকে উলঙ্গ করে গরম-উত্তপ্ত বালুর ওপর শোয়ানো হতো তারপর পেরেগ লাগানো জুতো পরে যুবকরা তার বুকের ওপর নাচতো আর বলেতো, বল! খোদা ছাড়া আরো অনেক উপাস্য আছে। বল! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী, যখন তারা মারতো তখন বেলাল (রা.) তাঁর হাবশী ভাষায় একথাই বলতেন, 'আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তিনি উত্তরে একথাই বলতেন, যত ইচ্ছা নির্যাতন করো যখন আমি দেখে নিয়েছি যে, খোদা এক তখন দু'জন কি করে বলবো। আর আমি জানি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল তখন আমি কিভাবে বলবো তিনি তা নয় বরং মিথ্যাবাদী। একথা শুনে তারা তাঁকে আরো মারতে থাকতো। গরমে এবং ঠান্ডায় উলঙ্গ করে পাথরের ওপর টানা

হেচরা করতো। তাঁর শরীরের চামড়া ক্ষত বিক্ষত হতো। চামড়া ছিড়ে যেতো কিন্তু তিনি সর্বদা বলতেন, 'আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আস্‌হাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র সত্য রসূল।

তাই হযরত বেলাল (রা.)-এর মনে এ ধারণা আসতে পারতো অথবা এসে থাকবে, আজ সেসব নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া হবে। আজ সেসব অত্যাচারের বদলা নেয়া হবে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন আবু সূফিয়ানকে বললেন, যে তোমার পতাকা তলে সমবেত হবে, যে খানা ক্বাবায় আশ্রয় নিবে, দরজা বন্ধ রাখবে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তখন বেলাল (রা.)-এর মনে হয়তো এ ধারনা এসে থাকবে, আপন ভাইদেরকে ক্ষমা করছে ভালো কথা কিন্তু আমার প্রতিশোধ কিভাবে নেয়া হবে? কেননা, সেদিন এমন ছিল, যেদিন কেবল সেই কষ্ট পেতে পারত যার সেখানে কেউ ছিল না এবং যার ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) বেলাল (রা.)-এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি (সা.) বলেন, হযরত বেলাল (রা.)'র ওপর যুলুম-নির্যাতনের প্রতিশোধ আমি গ্রহণ করবো আর এমন প্রতিশোধ নিবো যাতে আমার নবুয়তের মর্যাদাও বজায় থাকে আর বেলালের (রা.) হৃদয়ও আনন্দিত হয়।

তিনি বলেন, বেলালের পতাকা উত্তোলন করো আর মক্কার যেসব সর্দার জুতো পড়ে হযরত বেলাল (রা.)-এর বুকের ওপর চরে নাচানাচি করতো, যারা তাঁর পায়ে রশি বেঁধে টানা হেঁচড়া করতো, যারা তাঁকে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখতো আর বলতো, বল! আল্লাহ্ এক নয় আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল নয় তাহলেই তোর প্রাণ রক্ষা হবে এবং তুমি স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে। তাদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন, এ বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হও যাঁর ওপর তোমরা নির্যাতন করতে আর আজ সে বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে আশ্রয় নিলেই তোমাদেরও প্রাণ রক্ষা হবে আর তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও জীবন রক্ষা হবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি, যখন থেকে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, যখন থেকে মানুষ শক্তি লাভ করেছে আর যখন থেকে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের বিরুদ্ধে রক্তের প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে, সে শক্তি লাভ করেছে তখন থেকে এরূপ মহান প্রতিশোধ কেউই গ্রহণ করেনি। খানা ক্বাবার চত্তরে বেলাল (রা.)-এর পতাকা উড্ডীন করা হয় এবং আরবের সেসব সম্ভ্রান্ত নেতা যারা তাঁকে পদদলিত করতো আর বলতো, বল! বলবি কিনা যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল নয় বরং মিথ্যাবাদী। তারাই সেদিন নিজ স্ত্রী-সন্তানদের হাত ধরে দৌড়ে এসে না না বলে বেলালের পতাকা তলে আশ্রয় নিচ্ছিল, যাতে তাদের প্রাণ রক্ষা হয়; এভাবেই প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছিল। সেসময় বেলাল (রা.)-এর হৃদয় ও প্রাণ কিভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি উৎসর্গীত হচ্ছিল। তিনি হয়তো বলে থাকবেন, আমি এসব কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতাম কি না জানি না, অথবা নিতেই বা পারতাম কি না কিন্তু এখন এমনভাবে প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সে ব্যক্তি যার জুতো আমার বুকে উঠেছে তার মাথাকে মুহাম্মদ (সা.) আমার জুতোর ওপর নত করিয়ে দিয়েছেন। (সয়রে রূহানীর ৫৫৩-৫৬০ পৃষ্ঠা থেকে আরোহীত)

তারপর এরূপ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেলাল (রা.)-এর পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে এটিও জানিয়ে দিয়েছে যে, তিনি যাকে তোমরা দাস মনে করতে, তিনি যার কোন গোত্র বা আত্মীয়স্বজন মক্কায় ছিল না। তিনি একেবারেই নি.স্ব এবং পায়ে ঠেলার মত মানুষ মনে করে তোমরা তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছ। আজ শুন এবং দেখে নাও তোমরা শক্তিশালী নও, তোমরা সফলকামী নও, পরাক্রমশালী তোমরা নও বরং প্রবল পরাক্রমের অধিকারী হচ্ছেন বেলাল (রা.)-এর খোদা। মহা পরাক্রমশালী হচ্ছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদা, আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সে প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় খোদার বৈশিষ্ট্যাবলী অবলম্বন করেছেন এবং এ গুণাবলী ধারণ করেছেন। এভাবে বিজয় লাভের পর প্রতিশোধ নেন যাতে অহংকার বা গর্ব নেই। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে শত্রুদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে না বরং প্রজ্ঞার সাথে এমন সিদ্ধান্ত করেন যাতে প্রতিশোধও নেয়া হয় আর তোমাদেরকে তোমাদের ভুল-ত্রুটি বোঝার দিকেও মনযোগ আকর্ষিত হয়। আজ প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ী সে প্রবল পরাক্রমশালী খোদার সাথে পরিচয় করানোর জন্য, তোমাদের দৃষ্টিতে যে অসহায় মানুষ ছিল বরং তোমরা তাকে জীব-জন্তুরও অধম মনে করতে, তারই পতাকা তলে তোমাদেরকে আশ্রয় নিতে বলা হচ্ছে যাতে তোমাদের সম্বিত ফিরে, যখন তোমরা বেলাল (রা.)-এর বিরুদ্ধে নির্যাতনের আগুন প্রজ্জলিত করতে আর তোমাদের ধারণা অনুযায়ী স্বয়ং নিজেদেরকে মহাশক্তিশালী মনে করতে, আর ভাবতে এ অসহায় ও জ্ঞানহীন মানুষটির ওপর অত্যাচার করো তাহলে সে আপন ধর্ম থেকে সরে আসবে, সে ধর্ম পরিহার করবে। যা তোমাদের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞাশুন্য ধর্ম।

এসব অত্যাচারীর নেতা আবুল হাকাম নামে আখ্যায়িত হতো আর তারই নির্দেশে এসব যুলম নির্যাতন করা হতো। মক্কাবাসীদেরকে এটি বলার জন্যও এ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তোমরা যারা নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করতে, তোমরা যে নামধারী আবুল হাকাম এর পিছু অনুসরণ করছিলে সে মূলতঃ আবু জাহল ছিল। তোমরা যারা খোদাকে প্রবেশ পরাক্রমশালী মনে করতে না বরং নিজ প্রতিমাদেরকে সবকিছুর ওপর শক্তিশালী জ্ঞান করতে, আজ দেখে নাও প্রজ্ঞা বা সম্মান তোমাদের কাছে, তোমাদের নেতাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রতিমাসমূহের কাছে আছে নাকি এদের থেকে বিমুখ আর জাগতিক দৃষ্টিতে সেই হাবশী দাসের কাছে আছে, যিনি তাঁর বিচক্ষণতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও প্রজ্ঞার আলোকে সে জ্যোতিকে শনাক্ত করেছিল যা খোদার পক্ষ থেকে প্রেরীত এবং যার জন্য বিজয় ছিল নির্ধারিত। তাই যারা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়

**আমরা কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুলম-নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিবো না বরং সে রীতি অবলম্বন করতে হবে যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সম্মুখে তাঁর জীবনাদর্শের আলোকে উপস্থাপন করেছেন।**

খোদাতে বিশ্বাস রাখো তারা আজ এ দাসের পতাকা তলে আশ্রয় নাও। সে বেলাল (রা.) যাঁর প্রজ্ঞা তাঁর প্রভুর প্রজ্ঞার রঙে রঙিন হয়ে আরও মহান হয়েছে। আজ এ প্রজ্ঞাও জেনে রাখো শক্তি কিছুই নয়, অত্যাচারী কখনই স্থায়ী হয় না। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়ে যদি প্রজ্ঞাশীল ও জ্ঞানী করে থাকেন তাহলে এর সঠিক প্রয়োগ করো আর অন্য মানুষের মেধা, মনন ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্যায় অধিগ্রহণ করো না। অন্যের আবেগানুভূতির প্রতি যত্নবান হও, এমনি না করা প্রজ্ঞাহীন মানুষের কাজ।

তাই মহানবী (সা.) এ ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মক্কার কুরাইশ ও মক্কার সর্দারদের এটি বুঝিয়েছিলেন যে, জেনে রাখো প্রজ্ঞার দাবী অনুযায়ী মহাপরাক্রমশালী কেবল খোদার সত্ত্বা। যদি কেউ অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমাদের অধিন হয় তাহলে তাকে গোলামীর শিকলে এভাবে আবদ্ধ করবে না যদি কাল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যা কেউই জানে না যে কাল কি ঘটবে তাহলে তোমরা তার কাছেই প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বেড়াবে। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ ঘোষণা করে এবং এ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যেখানে মক্কার কুরাইশদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন তদ্রুপে কার্যত এ ঘোষণাও করিয়েছেন, আজ থেকে ক্রিতদাস প্রথা শেষ হলো। নির্যাতনও আজ থেকে বন্ধ হলো। আজ 'লা তাসরিব আলাইকুমুল ইয়াওমা'র ঘোষণা কেবল আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আমার মান্যকারীদেরও। অনুসারীদের মধ্যে সেসব দুর্বল মানুষও আছে যারা তোমাদের ক্রিতদাস থাকাকালে তোমাদের নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে।

এ অনুপম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত হযরত বেলাল (রা.)-কে বুঝিয়ে দিয়েছে, হে সেই দুর্বল মানুষ যে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার আলোকে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-কে চিনেছিলো। আজ যখন তোমার প্রজ্ঞা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে তখন তাদের বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করো, যারা তোমার পতাকা তলে সমবেত হবে তাদেরকে আপন পতাকা তলে আশ্রয় দিয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত করো আর যারা তোমার সম্মুখে নত হয়, যারা তোমার পায়ে মাথা নত করে তাদেরকে খোদার সমীপে অনুগত বানাও। এরপর গোটা পৃথিবী হুবহু সে দৃশ্যই দেখেছে আর এভাবেই ঘটতে দেখেছে, সেসব মানুষ যারা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করতো আর আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় প্রতিমা নির্মাণ করেছিল তারাই আল্লাহ্‌র সমীপে নত হয়েছে।

আজ আহমদীরাও স্মরণ রাখুন, এ দৃশ্যেরও পুনরাবৃত্তি হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা; এবং আমরা কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুলম-নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিবো না বরং সে রীতি অবলম্বন করতে হবে যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সম্মুখে তাঁর জীবনাদর্শের আলোকে উপস্থাপন করেছেন। আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা মনে রাখুন, তোমরা যারা আহমদীদেরকে কাণ্ড-জ্ঞানহীন মনে করো যে, তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে অনেক বড় ভুল করেছে। সময় বলবে যে কারা কাণ্ড-জ্ঞানহীন আর কারা জ্ঞানী। কারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর সঠিক সিদ্ধান্তই বা কারা নিয়েছে। তাই বিরোধীতা বন্ধ করো আর মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপে নত হও এবং তাঁর কাছেই প্রজ্ঞা কামনা করো।

আহমদীদের ওপর এই যে অত্যাচার হচ্ছে, তা বেশি সময় চলবে না ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। বিজয় আমাদের আর নিশ্চিত আমাদেরই, আজ প্রত্যেককে এটি বুঝা উচিৎ যে, ইনশাআল্লাহ্ সেদিন দূরে নয় যেদিন আমরা এদৃশ্য দেখবো। বিভিন্ন দেশে আহমদীদের ওপর যুলুম হয়, যেখানে মুসলিম সরকার আছে বা উলামাদের চাপ রয়েছে-সেখানে বেশি হয়।

আজও একটি বেদনাদায়ক শাহাদাতের সংবাদ এসেছে। শেখুপুরার সাইদ আহমদ নাসের সাহেবের যুবক ছেলে হুমায়ূন ওয়াকার'কে গত ৭ই ডিসেম্বর শেখুপুরারায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা শহীদ করেন। তিনি নিজ দোকানে বসে ছিলেন তখন তারা এসে গুলি করে শহীদ করে। তাঁর বয়স ছিল ৩২বছর। অত্যন্ত ভদ্র ও সজ্জন ছিলেন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া শেখুপুরার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। নাযেম তরবিয়ত ও নও মোবাইন ছিলেন। এসব শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না অবশ্যই উত্তম ফল বয়ে আনবে আর আনছে। এ ব্যাপারে আমাদের কোন চিন্তা নেই কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদেরকে জ্ঞান খাটানো উচিৎ এবং পূর্ববর্তী ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ, এতটা সীমালঙ্ঘন করো না যাতে তোমাদেরকে পরিশেষে লজ্জিত হতে হয়।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা সমুন্নত করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দিন।

ইনশাআল্লাহ্ নামায শেষে আমি তার গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

(৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালের পাক্ষিক আহমদী থেকে পুনর্মূদ্রিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

# ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

## (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

**প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১**

**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ**
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২য় অংশের ২য় কিস্তি)

**১৪নং প্রশ্নঃ** কুরআন করীমে যদিও মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়, কিন্তু এ মৃত্যুর নির্দিষ্টভাবে (বিশেষ) কোনো সময় তো প্রমাণিত হয় না। কাজেই হাদীস ও কুরআনের মধ্যকার বিরোধ দূর করার এছাড়া আর কী পথ আছে যে তাঁর মৃত্যু সে-সময়টিতেই হবে বলে ধরা হোক যখন হযরত মসীহ্ আকাশ থেকে নেমে আসবেন?

**উত্তরঃ** জানা আবশ্যক, কুরআন করীমের জ্বলন্ত ভাষ্যস্বরূপ আয়াত সমূহ এ বিষয়টিই যুক্তি-প্রমাণে স্পষ্টাকারে সাব্যস্ত করে যে, হযরত মসীহ্ তাঁর সে-যুগেই মারা যান, যে-যুগে তিনি বনী ইসরাঈলের বিকারগ্রস্ত ফিরকাগুলির সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন, **'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া ওয়া মুতাহ্‌হিরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারু ওয়া জায়িলুল্লাযীনাত্ তাবাউকা ফাওকাল্লাযীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল্ ক্বিয়ামাহ্'** [(আলে ইমরান: ৫৬) অর্থ: 'হে ঈসা আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করব এবং যারা অস্বীকারকারী তাদের ওপর তোমার অনুসারীদেরকে প্রাধান্য দান করব –অনুবাদক)]। এখানে স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে আল্লাহ্ তা'লা 'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' প্রথমে লিখেছেন এবং 'রাফিউকা' পরে বর্ণনা করেছেন। এতে করে প্রমাণিত হল যে, মৃত্যু আগে হয়েছে এবং 'রাফ্‌আ' হয়েছে মৃত্যুর পরে। এছাড়া আরও প্রমাণ হল যে, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটিতে আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' (হযরত ঈসাকে সম্বোধন পূর্বক) বলেন, 'আমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার মান্যকারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের তথা ইহুদীদের ওপর কিয়ামতকাল অবধি প্রাধান্য দান করব।' এখন এটা স্পষ্ট এবং খ্রিষ্টান ও মুসলমান সবাই স্বীকার করেন যে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্‌র পরে ইসলামধর্মের আবির্ভাব ও বিস্তারকাল যাবৎ প্রকাশ্যভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। কেননা খোদা তা'লা ইহুদীদেরকে ঈসা (আ.)-এর মান্যকারী খ্রিষ্টান ও মুসলমান উভয় জাতির প্রজা ও অধীনস্ত করেছেন এবং এখন পর্যন্ত সহস্র-সহস্র বছর ব্যাপী তারা অধীনস্ত হয়েই চলে আসছে। এমন তো নয় যে, হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হবার পর ইহুদীরা অধীনস্ত হবে। এরকম অর্থ প্রকাশ্যভাবে ভ্রান্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লক্ষ্যনীয় যে, কুরআন করীমে এ আয়াতও রয়েছে– যাতে মসীহ্‌র জবানীতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: **"ওয়া আওসানী বিস্‌সালাতি ওয়ায্‌যাকাতি মা দুমতু হাইয়া ওয়া বাররাম বি ওয়ালেদাতি"**। (সূরা মরিয়ম: ৩২-৩৩) অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ বলেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নামায ও যাকাত আদায় এবং আমার মায়ের প্রতি সবসময় সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন।" এখন এটা স্পষ্ট যে, আকাশে এ সকল শরীয়ত প্রদত্ত নির্দেশ পালন করা অসম্ভব। কাজেই, যারা হযরত মসীহ্‌র সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে যে, তাঁকে তাঁর দেহসহ আকাশে ওঠানো হয়েছে তাদের এটাও মানতে হবে যে, ইঞ্জিল ও তৌরাত অনুযায়ী বিধানগত যে সব কর্ম অবশ্যপালনীয় এগুলো হযরত মসীহ্‌র ওপর 'ওয়াজিব' (বাধ্যতামূলক), যা আকাশে পালন করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত! আশ্চর্যের বিষয় যে, এক দিকে তো খোদা তা'লা আদেশ দেন, 'হে ঈসা! যত দিন তুমি জীবিত থাক ততদিন তুমি তোমার মায়ের সেবা করবে, কিন্তু আবার নিজেই তাঁর মাকে তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করে দেন! তেমনি আজীবন যাকাত দানের আদেশ দিয়ে নিজেই কিনা তাঁকে এমন জায়গায় (অর্থাৎ আকাশে) পৌঁছে দেন যেখানে তিনি নিজে যাকাত দিতে পারেন না এবং যাকাত দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে উপদেশও দিতে পারেন না এবং নামাযের জন্যও কাউকে তাগিদ দিতে পারেন না। আল্লাহ্ তাঁকে মু'মিনদের জামাত থেকে দূরে সরিয়ে দেন, যাদের সাথে একত্রে থাকা নামায পরিপূর্ণভাবে আদায়ের জন্য আবশ্যিক ছিল! এভাবে আকাশে ওঠানোর ফলশ্রুতিতে (আবশ্যকীয়) ধর্মকর্ম পালনে তাঁর সমূহ ক্ষতি সাধিত হল! হুকুকুল-ইবাদ তথা সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য পালন ও সৎকাজের নির্দেশ এবং মন্দকাজ থেকে বারণ করার মত কর্তব্যগুলো পালনে বঞ্চিত হয়ে

অপূরণীয় ক্ষতি ছাড়া কী-বা লাভ হল?! এই আঠার শ' একান্নব্বই বছর কাল তিনি যদি পৃথিবীতে জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর কল্যাণমন্ডিত সত্তা দ্বারা সৃষ্টজীবের কত রকম উপকার সাধিত হতে পরতো?! কিন্তু তাঁর (আকাশে) উপরে ওঠে যাওয়ার দরুন এছাড়া আর কী-বা ফল দাঁড়লো যে তাঁর উম্মত বিপথগামী হল আর তিনি নিজে নবুওয়াতের খিদমতসমূহ পালনে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলেন?!

অতঃপর আমরা যখন এ আয়াতটিতে দৃষ্টি দেই– যেমন কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: 'কোন মানুষের শরীর আমি এমন করে বানাই নি যে, খাদ্যগ্রহণ ব্যতিরেকে সে জীবিত থাকতে পারে', তখন আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী এ-ও আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি (হযরত ঈসা) আকাশেও খাবার খান, মলমূত্র ত্যাগ করে থাকেন এবং মানবসূলভ জীবন যাপনে আবশ্যকীয় জিনিস– যেমন কাপড়, তৈজষপত্র ও খাদ্যদ্রব্য সবকিছু সেখানে তাঁর জন্য বিদ্যমান। কিন্তু এ সবকিছু কি কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত? কখনও প্রমাণিত নয়। পরিশেষে বিরুদ্ধবাদীগণ এ উত্তরই দেবেন, 'তিনি (মসীহ্) যে রীতি-নীতিতে আকাশে জীবন যাপন করেন, সেগুলো পৃথিবীতে মানুষের চলমান জীবনধারা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে জীবনযাপনকারী মানুষের মাঝে যে-সব প্রয়োজন দেখতে পাওয়া যায় সেই সবগুলোই আকাশে তাঁর ওপর থেকে তুলে দেয়া হয়েছে এবং আকাশে তাঁর শরীরকে এমন এক শরীরে পরিণত করা হয়েছে যা খাওয়া-খাদ্যের মুখাপেক্ষী নয় এবং পোষাক-আষাকেরও প্রয়োজন নেই ও মল-মুত্র ত্যাগেরও তাঁর প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীতে মানবদেহের ওপর যেভাবে সময়কালের পরিক্রমায় প্রভাব পড়ে সে-রকম প্রভাবও পড়ে না! তিনি সেখানে শরীয়তের বিধান পালনের আওতার বাইরে আছেন!' তবে এর জবাব হলো, খোদা তা'লা তো পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: **'ওয়ামা জায়াল্‌নাহুম জাসাদান্ লা ইয়া কুলুনাত্‌তোয়ামা'** [(আল-আম্বিয়া: ৯) অর্থ: 'এবং আমরা তাদেরকে এমন দেহবিশষ্ট করে সৃষ্টি করি নাই যারা খাবার খায় না'–অনুবাদক)। তাই স্পষ্ট যে, এ আয়াতে অংশবিশেষের উল্লেখ দ্বারা সাকুল্য বুঝায় অর্থাৎ যদিও কেবল এটুকুই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কোন নবীর শরীরই এরকম বানান নি যা খাদ্য গ্রহণ করা ছাড়া জীবিত থাকতে পারে। বরং প্রাসঙ্গিকভাবে খাদ্যের সাথে জড়িত যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়াদি ও যাবতীয় আবশ্যকীয় ফলাফলও ইঙ্গিতে বলে দিয়েছেন। অতএব, হযরত মসীহ্ যদি এই ভৌতিক মানবদেহ সহ আকাশে গিয়ে থাকেন তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে তিনি খাবার খেয়ে থাকেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করে থাকেন। এসবই তাঁর সাথে স্বভাবত জড়িত। কেননা পবিত্র ঐশী কালামে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই। তবে যদি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি হলো, হযরত মসীহ্ এই ভৌতিকদেহ সহ আকাশে যান নি। বরং ঐ দেহ তো ভূপৃষ্ঠেই সমাহিত হয়েছে এবং এক জ্যোতির্ময় দেহ মসীহ্ (আ.)-কে দান করা হয় যা খাওয়া-খাদ্য ও পানীয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল– সে-রকম দেহ দিয়ে তাঁকে ওঠানো হয়েছে।' তাহলে হে আলী জনাব! এটাই তো মৃত্যু, যা অবশেষে আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন। আমাদেরও এ অভিমতই বটে যে, পূত-পবিত্র ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুর পরে পরে একটি নূরানী (জ্যোতির্ময়) দেহ দান করা হয় এবং সেই নূর বা জ্যোতি যা তারা নিজেদের অভ্যন্তরে বহন করে থাকেন সেটিই তাদের জন্য দেহের মত হয়ে যায়। অতএব, সেটিসহ তাঁদের আকাশে ওঠানো হয়। এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এ আয়াতে, যেখানে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু হবেন: **"ইলাইহি ইয়াস্‌য়াদুল্ কালেমুত্ তৈয়ব ওয়াল্-আমালুস্ সালিহু ইয়ার্‌ফাউহু"** (আল ফাতির: ১১)। অর্থাৎ জ্যোতির্ময় অস্তিত্ববিশেষ সেসব আত্মা খোদা তা'লার দিকে উর্ধারোহণ করে থাকে এবং সৎকর্ম তাদের 'রাফ্‌আ' দান করে তথা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উন্নীত করে। অর্থাৎ যে পরিমাণ সৎকর্ম হবে, সে-পরিমাণ আত্মার 'রাফ্‌আ' (উন্নয়ন) সাধিত হবে।

এস্থলে আল্লাহ্ তা'লা 'রূহ্' বা আত্মাকে 'কলেমা' (ঐশীবাক্য) নামে অভিহিত করেছেন। এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বহণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে সকল আত্মা 'কলেমাতুল্লাহ্' (বা তাঁর কথা তথা নির্দেশের ফলশ্রুতিবিশেষ), যা মানুষের ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে এক দুর্ভেদ্য রহস্য স্বরূপ আত্মায় পরিণত হয়েছে। "ওয়া **'কালিমাতুহু আল্‌ক্বাহা ইলা মরিয়্যামা।"** [(আন্‌নিসা: ১৭২) অর্থ: 'তাঁর সেই কলেমা (কথা), যা তিনি মরিয়মের প্রতি আরোপ করেন"–অনুবাদক]। এ আয়াতটির বিষয়বস্তুও একই মর্মে ও ভিত্তিমূলে রয়েছে। আর এটি যেহেতু 'রবূবিয়্যাত' তথা ঐশী-প্রতিপালনের রহস্যময় গোপন তত্ত্ব, সেহেতু কারও পক্ষে এর চেয়ে অধিক কিছু বলার সাধ্য বা অবকাশ নেই যে, 'আল্লাহ্‌র কলেমা' বা কথাগুলোই তাঁর আদেশক্রমে আত্মার পোষাক স্বরূপ হয়ে থাকে। আর এগুলোতে ওইসব শক্তি বা ক্ষমতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়, যা মানবাত্মায় নিহিত দেখা যায়। এরপর পবিত্র সদাত্মাসমূহ যেহেতু 'ফানাফিল্লাহ্' (তথা আল্লাহ্‌তে বিলীন) হওয়ার অবস্থায় তাদের স্বকীয় সত্তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এবং ঐশী আনুগত্যে আত্মোৎসর্গীকৃত হয়ে পড়ে, সেহেতু অন্য কথায়, তারা আবার রূহ্ বা আত্মার অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে 'আল্লাহ্‌র কলেমা' বা বাক্যেই পরিণত হয়, যেমনটি তারা সূচনায় 'কলেমা তুল্লহ্' (স্বরূপ)-ই ছিল। অতএব 'কলেমাতুল্লাহ্' নামে তাদের অভিহিত করায় তাদের অতি উন্নত পর্যায়ে 'কামালীয়ত' বা পরিপূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত হয়। অতএব তাদের জ্যোতির পোষাক পরানো হয় এবং সৎকর্মের শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা খোদা তা'লার দিকে তাদের 'রাফ্‌আ' (উন্নীত হওয়া) সাধিত হয়। কিন্তু আমাদের বাহ্যদর্শী উলামা নিজেদের সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার দরুন 'কলেমুত্ তৈয়্যেব' (পবিত্র কথা বা বাক্যাবলী') দ্বারা কেবল আকিদা-বিশ্বাস কিংবা যিক্‌র-আযাকার বুঝায় বলে ধরে নিয়েছেন এবং 'আমলে সালেহ' (সৎ-কর্মসমূহ) বলতেও কেবল যিক্‌র-আয্‌কার ও দান-খয়রাত ইত্যাদি বুঝায় বলে মনে করেন। অতএব, অন্যকথায় তাঁরা তাদের এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'ইল্লাত' (কারণ) ও 'মাল্‌ল' (ফল) উভয়কে একাকার করে দেন। যদিও 'কলেমাতে-তৈয়্যেবা' তথা পবিত্র বাক্যাবলীও খোদা তা'লার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু এটি ঐশীতত্ত্বদর্শীদের জন্য সূক্ষ্ম ইঙ্গিতসূচক এক 'বাত্‌নি তথা গোপন রহস্যাবৃত অর্থ। (চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

# বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

**হযরত মির্যা তাহের আহমদ**
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২২তম কিস্তি)

## জাতি-ভেদ প্রথার প্রত্যাখ্যান

সমসাময়িক যামানাকে যে সকল অভিশাপ জরাজীর্ণ করে ফেলেছে, তার মধ্যে জাতি-ভেদ প্রথা এমন একটা অভিশাপ যা পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব চাইতে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি করে রেখেছে।

পবিত্র কুরআন শুধু মুসলমানদেরকেই নয়, সমগ্র মানবজাতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়:

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন; এবং উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার সাধন করেছেন এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপ আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (বিশেষ করে তাক্ওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী"। (আন নিসা-৪:২)

কারো ওপরে কারো শ্রেষ্ঠত্ব (Superiorty) নেই।

তেমনিভাবে, পবিত্র কুরআন বলে: "হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদের এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সার্বিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী সর্ববিদিত"। (আল্ হুজুরাত-৪৯:১৪)

এবং

"হে যারা ঈমান এনেছ! কোন জাতি যেন অন্য কোন জাতিকে হাসি-বিদ্রুপ না করে, তারা ওদের চাইতে উত্তম হতে পারে এবং নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে হাসি-বিদ্রুপ না করে, তারা ওদের চাইতে উত্তম হতে পারে। এবং তোমরা অপরের প্রতি দোষারোপ করো না; এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপনাম দিয়ে ডেকো না। ঈমান আনার পর দুষণীয় নাম (দ্বারা অভিহিত হওয়া) বড়ই মন্দ বিষয়, এবং যারা এরপর তওবা করবে না, তারাই যালেম।" (আল্ হুজুরাত-৪৯:১২)

দৃশ্যতঃ, মনে হচ্ছে, সমসাময়িক সমাজ জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ও বর্ণবাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এগুলোর দরুন সৃষ্ট ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। কিন্তু, আপনি যদি এই ইস্যুটাকে অধিকতর সতর্কতার সাথে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে আপনি উপলব্ধি করতে থাকবেন যে, জাতি-ভেদ সর্বত্রই বিদ্যমান রয়েছে।

'জাতি-ভেদ প্রথার' (Racialism) সংজ্ঞা নিরূপন করাই একটা বড় সমস্যা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংজ্ঞা বিভিন্ন রকম হতে পারে। জাতি-ভেদ প্রথা, শ্রেণী-চেতনা, ধর্মীয়-শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রীয় ভেদাভেদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদ- এগুলোর মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা মুশকিল।

পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টানদের হাতে হাজার বছরেরও অধিকাল ধরে, ইহুদীরা যে মর্মান্তিক ও অমানবিক নির্যাতন ভোগ করেছিল, তা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গছে বলে ধরে নেওয়া তে পারে; কিন্তু বিগত তিরিশ ও চল্লিশের দশকে নাৎসীদের হাতে ইহুদীদের পাশাবিক দুর্ভোগের কথা তো এখনই আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। সুতরাং যে মুহূর্তে আমরা 'গোষ্ঠীবাদ' বা

'জাতি-ভেদ' শব্দটা শুনতে পাই, সেই মুহূর্তেই আমাদের মন অনবধানবশতঃ সেমেটিক-বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং অ-ইহুদীদের হাতে সেমেটিক জাতির দুর্ভোগের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতি বিনষ্ট হয়।

এটা অবশ্য গোষ্ঠীবাদ বা জাতিবাদের অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার অত্যন্ত সীমিত উপলব্ধি। এটা এত সীমিত যে, এই দৃশ্যপটের অন্তঃস্থিত বিষয়গুলো কোনভাবেই আমাদের গোচরীভূত হয় না। আমরা উগ্রবাদী ইহুদীদের কথা চিন্তা না করেও পারি না। তারা অ-ইহুদীদের প্রতি সেই একই রকম ভয়ংকর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, যার লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়েছে এখন তারা নিজেরাই।

কিন্তু, এটাই সবটা নয়। জাতিভেদ প্রথার মধ্যে এমন আরও অনেক কিছু আছে যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। জাতিভেদ প্রথা এখনও পরিষ্কাররূপে চিহ্নিত নয় যদিও, তবু তা বিদ্যমান রয়েছে বিভিন্ন চেহারায় এগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। এছাড়াও ধর্মীয়, গোত্রীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থ-চেতনাও এগুলোর মধ্যে কয়েকটি, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথা কাজ করে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন নামে। অশ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ জাতির যে কুসংস্কার তা-ও জাতিভেদ প্রথারই একটা রূপ। তবে, শুধু শ্বেতাঙ্গদেরকেই এই দোষ দেওয়াটা ঠিক হবে না যে, কেবল তারাই ঐ সকল জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায়। যাদের গায়ের রঙ তাদের মত নয়। কৃষ্ণাঙ্গ জাতিভেদও আছে। পীত জাতি-ভেদও আছে। এবং তাদেরও মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আছে যাদের গায়ের রঙ না সাদা, না কালো, না পীত, বরং এর মাঝামাঝি এক রকম।

জাতি-ভেদ প্রথার সার কথা হচ্ছে– শ্রেণী-সংস্কার। এটাই, সম্ভবতঃ, জাতিভেদ প্রথার সর্বোত্তম সংজ্ঞা। এক শ্রেণীর মানুষ যখন পূর্ব-সংস্কারবশতঃ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের অজুহাতে আর এক শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে, তখন জাতিভেদ কুণ্ডলী ছেড়ে সোজা হয় এবং তার কুৎসিৎ ও বিষাক্ত ফনা তুলে দাঁড়ায়। ঘৃণা ছড়ানোর ক্ষেত্রে তখন আর কোনও বাছ-বিচার করা হয় না, ব্যক্তিগত গুণাগুণও বিচার করা হয় না, সার্বজনীনতাই তখন আইন হয়ে দাঁড়ায়।

খুব বেশী শতাব্দী আগের কথা নয়, পশ্চিম গোলার্ধ ভাগাভাগি হয়ে পড়েছিল খৃষ্টান বনাম মুসলমানদের মধ্যে। যেই ভয়ানক ধর্মীয় কুসংস্কারের যুগে ইহুদীরা মুসলিম প্রাচ্যের প্রতি যে ভূমিকাই পালন করে থাকুক না কেন, তা তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট; যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, ইহুদীরা ছিল সেই খৃষ্টান ইউরোপেরই একটা অংশ বিশেষ, যারা ভূমধ্যসাগরের চতুস্পার্শবর্তী মুসলিম জাতিগুলোকে ঘৃণা করতো এবং অবিশ্বাস করতো, এবং তারা পাশ্চাত্যে মুসলিম সম্প্রসারণের ভয়েও শংকিত ছিল।

খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে চরম শত্রুতার সময়কালে জাতি-ভেদ প্রথার মধ্যে একটা নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছিল, এবং তা ছিল বর্ণের পার্থক্য। সে সময়ে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন ও ভারতের মুসলমানরা ছিল সম্পূর্ণরূপে আলাদা ও নির্বিকার। বিবাদটা ছিল অনেকটা তুর্কো-আরব জোট বনাম খৃষ্টান ইউরোপের বিবাদের মতই।

সেই ইতিহাস যদিও চাপা পড়ে গেছে এবং মানুষে তা ভুলেই গেছে বলে মনে হয়, তবু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সেই ইতিহাস আবারও মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠছে। মানবীয় সমস্যাগুলো কখনই চিরস্থায়ীভাবে শেষ হয়ে যায় না, তা যতই না গভীরে সেগুলোক পুঁতে ফেলা হোক। বর্তমান যুগের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও দেখা যাবে যে, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীটা দু'টো পরাশক্তি ও তাদের মিত্রদের মধ্যে মেরুকরণ করা ছিল, ততদিন পাশ্চাত্যের স্বার্থের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সে ঐ ধরণের ইস্যুগুলোকে উত্তেজিত করে তুলবে না বা সেগুলোকে উত্তেজিত হতে দিবে না। কিন্তু প্রাচ্য প্রতীচ্যের সম্পর্কে নতুন যুগ শরু হওয়ার পর থেকে মধ্যযুগীয় এক 'কালো নাইট' (Knight) তার অশুভ ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

খৃষ্টান-মুসলিম ধর্মকেন্দ্রী-রাজনীতির (Religio-Political) ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা পুনরায় শুরু হওয়ার বাস্তব বিপদ দেখা দিচ্ছে; এবং এবারে তা হবে এক নতুন আবহাওয়া, যা সৃষ্টি হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অতি গুরুত্বপূর্ণ পরির্তনের ফলে। এটা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে উভয় পক্ষের কায়েমী স্বার্থের খাতিরে। আমার ভয় হয় যে, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মোল্লা-পুরোহিতেরা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে একটা ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থানের তাবৎ সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিতে এটা যদি ঘটেই যায়, তাহলে ইসরাঈল তার স্বার্থে অনুকূলে একটা সুবিধা পেয়ে যাবে। এটা তো আশা করা যায় না যে, অমন একটা পরিস্থিতিতে ইসরাঈল জড়িয়ে পড়বে না, এবং চুপচাপ বসে থাকবে।

তাছাড়া, রাজনীতিকেন্দ্রী অর্থনৈতিক (Political-Economic) বিভক্তিকরণের যে সীমারেখাগুলো রয়েছে, সেগুলোও একটা নতুন ধরণের জাতি-ভেদ প্রথার জন্ম দিচ্ছে। অর্থাৎ, ধনী-উত্তর এবং নির্ধন-দক্ষিণের মধ্যে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে নতুন ধরণের জাতি-ভেদ চেতনা জন্ম নিচ্ছে। আরও পরিষ্কার করে বলতে চাইলে বলতে হয়।

প্রাচ্য তো প্রাচ্যই, আর প্রতীচ্য প্রতীচ্যই
এ দু'য়ের মিলন সাধন হবে না কখনই।

পরাশক্তিগুলোর সাম্প্রতিক সমঝোতা ও দাঁতাত খৃষ্টান-প্রতীচ্য এবং মুসলিম প্রাচ্যের মধ্যে আবারও সেই ঐতিহাসিক ধর্মকেন্দ্রী-রাজনৈতিক বিতণ্ডা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করতে পারে। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিক দাঁতাতের দরুন নব্য-সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যাপকভিত্তিক জাতি-ভেদ চেতনা জন্ম নিতে বাধ্য। এবং পরিণামে যদি পূর্ব ও পশ্চিম একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে তা আদৌ কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না।

মনে হতে পারে যে, সর্বজনগৃহীত পরিভাষা অনুযায়ী জাতি-ভেদ প্রথার যে সংজ্ঞা, তা থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছি এবং তাকে এমন সম্প্রসারিত করছি যে,

তার মধ্যে এমন অনক কিছু অন্তর্ভুক্ত করছি যার সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু, আমার যে অভিমত, তা সেই সব মানবীয় প্রেরণার উপরে এক নিরাসক্ত মনের গভীর গভেষণাপ্রসূত ফল, যা থেকে জন্ম নেয় জাতি-ভেদ প্রথা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্নিহিত সেই প্রেরণা বা চালিকা-শক্তিগুলো বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ সেই ব্যাধিও থেকে যাবে। তা সেই বিকৃত মানবাচরণকে আপনি জাতিভেদ প্রথাই বলুন, কিংবা কোন সুন্দর ও সভ্য নামেই অভিহিত করুন। জাতি-ভেদ প্রথাকে, বৃহত্তর অর্থে, বুঝাতে হবে গোষ্ঠীসংস্কারূপে, যা নিরংকুশ ইনসাফ ও ন্যায়পরতার পরিপন্থী। আমেরিকান ও রাশিয়ান ব্লকের মধ্যেকার মেরুকরণ দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ায় আমরা এমন একটা নতুন যুগে এসে পড়েছি, যখন আমরা বিভক্তি দূরীকরণের পরিবর্তে বিশ্বজোড়া এক পুনর্বিন্যাসের দিকে দাবিত হচ্ছি। আদর্শভিত্তিক বিভাগ অস্পষ্ট হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে চিহ্নিত বিভক্তিসমূহ দেখা দিতে বাধ্য এবং তা অধিকার স্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত হতেও বাধ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার আদিম ঐতিহ্যগত বিভক্তিটা অস্পষ্ট হয়ে শেষে একটা তাৎপর্যহীন দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে এসেছিল পুঁজিবাদী-সমাজাবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীতার চূড়ান্ত পর্যায়ে। সেটা আর এখন নেই। তাই, সর্বাধিক ঘোষিত সেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভক্তিটা আবারও একবার দেখা দিবে এবং তা দেখা দিবে, বিশেষ করে, প্রতীচ্যের উন্নত জাতিগুলো এবং প্রাচ্যের অনুন্নত জাতিগুলোর মধ্যে।

মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো এবং রাশিয়া ক্রমান্বয়ে তাদের অবস্থান থেকে সরে যাবে এবং পরিশেষে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যোগ দিবে, এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি অভিন্ন দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করবে। যদিও বিদেশী বাজার দখল ও একচেটিয়া করণের প্রতিযোগিতার কারণে তাদের মধ্যে নতুন নতুন বৈরিতাও দেখা দিবে তবু সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য পূর্বের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী রাজনীতিকেন্দ্রী অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পূর্ব ইউরোপীয় ব্লকটাকে অঙ্গীভূত করে ফেলবে। এতে একটা অধিকতর স্বস্তিও ফিরে আসবে, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার ঐতিহ্যগত বিভক্তিটা অধিক গুরুত্ব লাভ করবে।

এর সঙ্গে যোগ দিবে নব্য-সমাজতন্ত্রের জন্ম। যে সমাজতন্ত্রে এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীকে স্থানচ্যুত করবে জাতিবর্গ। কাজেই বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মেরুকরণ তখন আর একজাতির ধনীদের এবং অপর এক জাতির গরীবদের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে হবে না। আগামী কয়েক বছরের জন্য এই সর্বনাশা মেরুকরণ হয়তোবা অবদমিত বা ভোঁতা করে রাখা যেতে পারে, কিন্তু আখেরে ব্যাপক আকারের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষকে কিছুতেই বরাবরের জন্য এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে না।

আমি গভীরভাবে শংকিত যে, আমরা একটা বিশ্বজোড়া অত্যন্ত জঘন্য নব্যজাতিভেদ প্রথার যুগে প্রবেশ করছি, যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং যাকে প্রশ্রয় দিতে পারে ইহুদী বা জাইঅ্যানবাদী (Zionist) নেতৃত্বের একটা অংশ। যদি হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্জামিন বেইত-হাল্লামী কর্তৃক রচিত পুস্তক "The Israeli Connection: Whom Israeli Arms and why- (Published in 1988 by I.B.Touris & Co. Ltd., London)-এর কথা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়, এবং জাইঅ্যানবাদীদের সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের যে সকল তথ্য প্রমাণ তিনি তার পুস্তকে পেশ করেছেন সেগুলো যদি প্রামাণিক বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তা বিশ্বশান্তির সম্ভাবনার বিপক্ষেই চলে যাবে।

বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীতে ইসরাঈল যে ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও তার যে ভূমিকা পালন করার বাকী আছে, তা থেকে নিম্ন বর্ণিত দৃশ্যই ফুটে ওঠে:

ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠাতা-জনক ডেভিড বেন-গুরিওন ১৯৫৭-এর জানুয়ারিতে বলেছিলেনঃ 'আমাদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার দিক থেকে একটা ইউরোপীয় দেশের বন্ধুত্ব এশিয়ার সমস্ত মানুষের মতামতের চাইতে মূল্যবান।' (Medzini, 1976; p.75) p.5 'আরবদের বিরুদ্ধে পুনরায় প্রাধান্য অর্জনের জন্য ইসরাঈলের নিজের উদ্বেগ এবং আমেরিকার সাম্রাজ্য-বিস্তারের পতন রোধের লক্ষ্য একত্রে মিলিত হয়েছে' (পৃ. ২০৫)।

(চলবে)

## "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
**মাহবুব হোসেন**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

# ‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

**মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান,** মুরব্বী সিলসিলাহ

(৪র্থ কিস্তি)

### অন্যের মনস্তুষ্টি করা এবং মন না ভাঙ্গা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিতে কিছু কিছু বিষয় খুবই স্পষ্ট ছিল, তার মাঝে অন্যতম হল, তিনি কখনও কারো মনে আঘাত দেয়া পছন্দ করতে না। আর তিনি এ বিষয়ে সচেতন থাকতেন এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে বারণ করতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, তাঁর জীবনীর এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে, তিনি সর্বাত্মকভাবে অন্যদের মনস্তুষ্টি করতেন এবং কারো মনে আঘাত দিতেন না। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫০০)

(২) সায়্যেদ মুহাম্মদ শাহ সাহেব বর্ণনা করেন, “একবার আমার এক শাগরেদ আমাকে একটি দামী কাঠের লাঠি উপহার হিসাবে দিয়েছে। আমি ভাবলাম, আমি এই লাঠিটি হযরত আকদাসের খেদমতে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে দিব। অতঃপর আমি কাদিয়ান গিয়ে সকাল বেলায় যখন হুযূর আকদাস প্রাত:ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছেন তখন এই লাঠিটি পেশ করলাম। কিন্তু হুযূরের হাতে যে লাঠিটি ছিল তা তুলনামূলকভাবে আমার দেয়া লাঠির চেয়ে অনেক সুন্দর ও উন্নত ছিল। আমি ভাবতে লাগলাম হয়তবা আমার এই লাঠিটি গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু হুযূর আকদাস অত্যন্ত স্নেহের সাথে এটিকে গ্রহণ করে দোয়া করলেন। এরপর তিন চারদিন হুযূর আমার দেয়া লাঠিটি নিয়ে প্রাত:ভ্রমণে গেলেন এটি দেখে আমর মন ভরে যায় এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে।” (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪৯)

(৩) মুন্সী আব্দুল আযীয সাহেব উজলভী(রা.) বর্ণনা করেন, একদিন দুধে পূর্ণ একটি পাত্র হুযূরের শিয়রে রাখা ছিল। আমি এটিকে পানি মনে করে পাত্র ধুওয়ার সময় যেভাবে নাড়া হয় আমি সেভাবে নেড়ে ফেলে দিলাম। ফেলে দেয়ার সাথে সাথে যখন বুঝলাম, আমি খুবই অনুতপ্ত হলাম। কিন্তু হুযূর খুবই স্নেহ ও আদরের সাথে বললেন, ভালই হয়েছে আপনি এটি ফেলে দিয়েছেন, হয়তো এতক্ষণে এই দুধ নষ্টই হয়ে গিয়েছিল। একথা তিনি কয়েকবার বললেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৭)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, প্রাথমিক দিনগুলোর কথা- সম্মানিত পিতা অর্থাৎ মরহুম হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) নিজের একটি ব্যবহৃত কোট আমার খালাত ভাই সায়্যেদ মুহাম্মদ সাঈদকে কাজের মহিলাকে দিয়ে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। সায়্যেদ সাঈদ সাহেব তখন কাদিয়ানে ছিলেন। মুহাম্মদ সাঈদ খুবই অবজ্ঞার সাথে সেই কোট ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, “আমি কোন ব্যবহৃত জিনিস পরিধান করি না”। সেই মহিলা যখন কোটটি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? মহিলা উত্তরে বলল, মীর সাহেব এই কোট মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এই বলে এটি ফিরিয়ে দিলেন যে, তিনি ব্যবহৃত কাপড় পরেন না। হযরত সাহেব বললেন, এতে মীর সাহেব মনঃকষ্ট পাবেন। তুমি এই কোট আমাকে দিয়ে যাও, আমি পরব। আর মীর সাহেবকে বলে দিও আমি এটি রেখে দিয়েছি।” (সীরাতুর মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩২)

(৫) মাস্টার আল্লাহ দাত্তা সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার লাহোর আহমদীয়া বিল্ডিংস-এ হুযূর আকদাস অবস্থান করছিলেন, শরকপুর ভেনী থেকে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি হুযূরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। ভক্তবৃন্দের এত ভিড় ছিল যে, সেই বৃদ্ধ হুযূর আকদাস পর্যন্ত পৌছতেই পারল না। তখন সে উচ্চস্বরে বলে উঠল, হুযূর আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলাম। হুযূর আকদাস বললেন, বাবা জি কে সামনে আসতে দাও। কিন্তু সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ঠিকভাবে উঠতে পারে নি। এটি দেখে হুযূর বললেন, বাবাজির কষ্ট হচ্ছে, এরপর হুযূর নিজে উঠে গিয়ে তার কাছে বসলেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪০)

### শেখা ও শেখানো

(১) মিঞা আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, তখনও হুযূর বয়াত করানো শুরু করেন নি। একবার হযরত আকদাস সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর আপনি আমার বয়াত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, পীরের কাজ ঝাড়ুদারের কাজের ন্যায়। নিজ শিষ্যদের ময়লা বের করে করে পরিষ্কার করতে হয় আর আমি এই কাজে কষ্ট অনুভব করি। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর তাহলে কোন একটা সম্পর্ক তো থাকা চাই। আমি আসি আর এভাবে থেকেই চলে যাই। হুযূর বললেন, ঠিক আছে তুমি আমার শাগরেদ হয়ে যাও আমি তোমাকে পবিত্র কুরআনের অর্থ পড়াবো। ... হুযূর আমাকে সপ্তাহে এক আয়াতের সাবলিল অর্থ পড়িয়ে দিতেন। আর কখনও কখনও কোন আয়াতের সামান্য তফসীরও বলে দিতেন। একদিন বললেন, মিঞা আব্দুল্লাহ! আমি তোমাকে পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী বিশদভাবে

না বলার কারণ হল, আমি তোমার মাঝে তা সহ্য করার ক্ষমতা দেখি না। মিঞা আব্দুল্লাহ সাহেব বললেন, এর অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হল, আমাকে যদি তখন এসব বলা হত তাহলে আমি উন্মাদ হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি এই সাবলিল অনুবাদই আধা পারার মত যতটুকুই পড়েছি এর কারণে এখন পর্যন্ত আমি আমার মাঝে কুরআন বুঝার বিষয়ে এক বিশেষ প্রভাব অনুভব করি।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১)

(২) মৌলবী শের আলী সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব বলতেন, আমাদের জামাতের সদস্যদের উচিত কমপক্ষে তিনবার আমার পুস্তক পড়া। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আমার পুস্তক অধ্যায়ন করে না তার মাঝে এক ধরণের অহংকার বিদ্যমান। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৭)

(৩) কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশাওরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন প্রথম প্রথম কাদিয়ান গিয়েছি তখন এক ব্যক্তি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার ছেলেকে পাঠিয়েছে। সেই ছেলেটি যখন হযরত সাহেবের সাথে করমর্দন করার জন্য সামনে অগ্রসর হল তখন সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হযরত সাহেবের পায়ে হাত লাগাতে উদ্দত হয়েছে। তখন হযরত সাহেব তার পবিত্র হাত দিয়ে তাকে একাজ করতে বারণ করেছেন। আর আমি লক্ষ্য করেছি, হযরত সাহেবের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি(আ.) অত্যান্ত প্রতাপের সাথে বললেন, নবী-রসূলগণ দুনিয়াতে অংশিবাদিতাকে দূরিভূত করার জন্য আগমন করেছেন আর আমার কাজও শিরক দূরিভূত করা, শিরক প্রতিষ্ঠা করা নয়।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মরহুম হাকীম ফজল দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-কে বললেন, হুযূর আপনি আমাকে কুরআন পড়ান। উত্তরে তিনি(আ.) বললেন, ঠিক আছে। হাকীম ফজল দীন সাহেব প্রতিদিন চাশতের সময় মসজিদে মোবারকে আসতেন আর হযরত সাহেব তাকে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ কিছুটা পড়িয়ে দিতেন। এটি কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এরপর বন্ধ হয়ে যায়। এটি সাধারণভাবে কোন দরস ছিল না, শুধুমাত্র সাবলীল অনুবাদ পড়িয়ে দিতেন আর এই ঘটনা মসীহ দাবীর যুগের প্রথম দিকের ঘটনা।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৩)

## আস্‌সালামু আলাইকুম বলা

(১) কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) সালামের বিষয়ে এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, আমি বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করেছি, হুযূর যদি কয়েক মিনিটের জন্যও যদি সভা থেকে উঠে ঘরে যেতেন প্রতিবারই যেতে এবং আসতে 'আস্‌সালামু আলাইকুম বলতেন'। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৩)

(২) মৌলবী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেব কোন একটি বিষয় বা উদ্ধৃতির কাজ মিঞা মেরাজ দীন সাহেব, উমর লাহোরী এবং আরো কয়েকজনকে অর্পন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে মিঞা মেরাজ দীন সাহেব ছোট ছোট চিরকুট লিখে বার বার হযরত সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন আর হযরত সাহেব উত্তর দিতেন যে, এটা খুঁজ বা উমুক পুস্তকে দেখ ইত্যাদী ইত্যাদী। অন্য এক সময় মিঞা মেরাজ দীন সাহেব একটি চিরকুট লিখে হযরত সাহেবকে পাঠান এবং হযরত সাহেবকে সম্বোধন করে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' না লিখেই নিজের কথা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু বার বার এমন চিরকুট আদান প্রদান হচ্ছে তাই তাড়াহুড়ায় তিনি এটি খেয়াল করেন নি যে, আস্‌সালামু আলাইকুম লেখা উচিত ছিল। হযরত সাহেব যখন ভেতর থেকে এর উত্তর লিখে পাঠিয়েছেন তখন শুরুতেই লিখেছেন, আপনার আস্‌সালামু আলাইকুম লেখা উচিত ছিল।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা- ২৯৯)

(৩) হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম এ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, তিনি তাঁর সকল চিঠি-পত্রে 'বিসমিল্লাহ' এবং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' লিখতেন এবং চিঠির শেষে স্বাক্ষর করে তারিখও লেখে দিতেন। আমি তাঁর কোন চিঠি বিসমিল্লাহ্ ও সালাম এবং তারিখ ছাড়া দেখি নি। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৯)

(৪) মীর শফী আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর মাঝে একটি বিশেষ গুণ দেখেছি আর তা হল, যতবারই হুযূর বাইরে যেতেন আমি দৌড়ে গিয়ে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতাম এবং করমর্দন করার জন্য হাত প্রসারিত করতাম। হুযূর সংগে সংগে নিজের হাত আমার হাতে এমনভাবে দিয়ে দিতেন যেন সেই হাতে কোন শক্তিই নেই বা এই হাত এখন পুরোপুরি আমাকে সপে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যা চাও এখন এই হাতের সাথে কর। আমি তাঁর হাত নিয়ে অনেক চুমু খেতাম, চোখে লাগাতাম এবং মাথায়ও বুলাতাম কিন্তু হুযূর কিছুই বলতেন না। দিনে অসংখ্য বার এমন করতাম কিন্তু তিনি(আ.) একবারও বলতেন না যে, "তোমার কী হয়েছে এখনই তো করমর্দন করলে? পাঁচ মিনিট পর পর করমর্দন করার কী প্রয়োজন"? (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৩৫)

(৫) কাশ্মির নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখনই কোন ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সালাম দিত তখন হুযূর সাধারণত তার দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার সাথে সালামের উত্তর দিতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬০)

(৬) মৌলবী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মরহুম ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল খান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বললেন, আমার সাথে হাসপাতালে এক ইংরেজ বয়স্কা (বুড়ো) মহিলা ডাক্তার কাজ করে আর সে যেকোন সময় এসে আমার সাথে করমর্দন করে এ বিষয়ে নির্দেশনা কী? হযরত সাহেব উত্তর দিলেন, এটি জায়েয নয়। আপনার স্পষ্ট অপারগতা জানিয়ে দেয়া উচিত, আমাদের ধর্মে এটি জায়েয তথা বৈধ নয়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০১)

(চলবে)

# কলমের জিহাদ

**আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-**
**'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'**
- ইমাম মাহদী (আ.)

**"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"**
- আল কুরআন

**মুহাম্মদ খলিলুর রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর– ৭৬)

**"ইয়া'জূজ-মা'জূজের সময় প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক"**

"আজিজ" আগুনকে বলা হয় যা হতে ইয়া'জূজ মা'জূজ শব্দের সৃষ্টি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বুঝিয়েছেন যে, ইয়া'জূজ মা'জূজ সেই জাতি যারা পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতি হতে আগুনের প্রয়োগের শিক্ষক বরং আবিষ্কারক হবে। এই নামগুলিতে এও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের জাহাজ, রেলগাড়ী ও যন্ত্রগুলি আগুন দ্বারা চালিত হবে, এবং তাদের যুদ্ধও আগুন দ্বারা হবে, তারা আগুন দ্বারা কাজ নিতে দুনিয়ার সকল জাতি হ'তে দক্ষ হবে। এ জন্য তা'রা ইয়া'জূজ মা'জূজ বলে অভিহিত হবে। সুতরাং তারা হ'ল ইউরোপবাসী যারা আগুনের কলাকৌশলে এমন বিজ্ঞ, সক্রিয় ও অদ্বিতীয় যার বেশি বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বের ঐ ঐশী পুস্তকেও, যা বনী ইসরাঈলের নবীদের দেয়া হয়েছে, ইউরোপবাসীদেরকেই ইয়া'জূজ বলা হয়েছে। এমনকি মস্কোর নাম লেখা হয়েছে যা রাশিয়ার আদি রাজধানী। সুতরাং ইয়া'জূজ মা'জূজের যুগে মসীহ মাউদের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল।" (রূহানী খাযায়েন, ১৪শ খন্ড, পৃঃ ২২৪)

**নিঃশ্বাসে কাফের ধ্বংস:**

হযরত ঈসা (আ.)-এর ফুৎকার বা নিঃশ্বাসে কাফেরগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী কতটুকু বাস্তব সম্মত? এ কথার রূপক অর্থ- অর্থাৎ যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনের মাধ্যমে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করনের অর্থগ্রহণ করলে অধিকতর যুক্তিসংগত হয় কি-না তা ভেবে দেখা দরকার।

**আহমদীয়া-বিরোধী অপ-প্রচারকারীদের জন্য প্রশ্ন:**

**প্রথম প্রশ্ন হলো:** রূপক-বর্ণনার অন্তর্নিহিত বিষয়ের অর্থ নিরূপণের জন্য সঠিক পথ ও পন্থা কি? এই বিষয়ে আহমদীয়া মুসলমানদের যে বিশ্বাস তা অন্যেরা তূলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন কি?

"আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় হযরত মসীহ অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের বিষয়টিকে গ্রহণ করে রূপক এবং আলঙ্কারিক অর্থে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও রূপকাশ্রিত। আমরা, আহমদীয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে শুধু বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হলে এগুলির প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য, গৌরব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে না। অথচ, এগুলির আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হওয়ার উপরেই জোর দিয়ে থাকে অন্যান্য মুসলিম ফের্কা বা সম্প্রদায়গুলো। এটাই সেই মৌলিক পার্থক্য, যা কিনা আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অন্যান্য সকল সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। ...আহমদীয়া দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় ইতিহাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদীদের দর্শন হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী-প্রসূত এবং তা ধর্মের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস-বিরুদ্ধ।" [আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.)-এর লেখা 'ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন' পুস্তক]

প্রশ্ন হলো এই যে, বিষয়টি সম্পর্কে তূলনামূলকভাবে বিচার-বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে সত্য ও সঠিক পথ ও পন্থা কোনটি? দিনকে দিন এবং রাতকে রাত বলতে বিরুদ্ধবাদীগণ সৎসাহস দেখাতে পারবেন কি?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিষয়টি সম্পর্কে হিজরী একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলফে-সানী হযরত সৈয়দ আহমদ সারহিন্দি (রহ) লিখেছেন: "মাহদী (আ.) বর্ণিত আধ্যাত্মিক সুক্ষ্মতত্ত্বাবলী বুঝিতে না পারিয়া বাহ্যদর্শী আলেমগণ ঐগুলিকে কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধ মনে করিবে এবং অস্বীকার করিবে।" (মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, ২য় খণ্ড, ৫৫ পৃ.)। এই মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বর্তমান যুগের বহু দল–উপদলে বিভক্ত এবং কলহ–কোন্দলে নিমজ্জিত তথাকথিত আলেমগণ অস্বীকার করতে পারবেন কি?

**দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো:** আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীতে

ব্যবহৃত রূপক বর্ণনাসমূহ সঠিকভাবে বাখ্যা-বিশ্লেষণ করতঃ সত্য-সন্ধানীগণ তাঁর উদাত্ত আহবানের প্রতি সাড়া দিবেন কি?

ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপকের ব্যবহার সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.) ঘোষণা করেছেন: "আমি বার বার বলিয়াছি এবং ইহাই সত্য কথা যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপকের ব্যবহার খুব বেশী থাকে এবং একাংশ প্রকাশ্য অর্থেও পূর্ণ হয়। এই নিয়মই আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সমস্ত হাদীসই যদি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন-শিয়াদের হাদীস, সুন্নীদের হাদীস এবং এইরূপে সকল সম্প্রদায়ের সকল হাদীসই যদি পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্মরণ রখিও যে মসীহ্ (আ.) অথবা মাহ্দী (আ.) কেহই কখন আসিবেন না। বিবেচনা কর, আমার চেয়ে রসূল করীম মুহাম্মদ (সা.)-এর আবশ্যকতা অনেক বেশী ছিল। তিনি যখন আসিলেন, তখন ইহুদী-খৃষ্টান এবং অন্যান্যদের মধ্যে সকলেই কি তাঁহাকে মানিয়া লইয়াছিল? খোদার উদ্দেশ্যে একবার চিন্তা করিয়া দেখ এবং উত্তর দাও। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল গল্প প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের গ্রন্থে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তৎসমুদয়ই যদি পূর্ণ হইয়া থাকিত, তবে কি কারণে তাহারা তাঁহাকে মানিয়া নেয় নাই? জানিয়া রাখ, সমুদয় লক্ষণ কখনও পূর্ণ হয় না। কারণ কতক লক্ষণ লোকদের কল্পিত, আর কতকগুলি কল্পিত না হইলেও উহার ভূল অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নবী মাত্রকেই অস্বীকার করা হইয়াছে এবং অজুহাত দেখান হইয়াছে যে সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ হয় নাই। এখনও মানুষ এই চির-প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতেছে। যে ব্যক্তি অন্তর খুলিয়া আমার কথা শুনিবে, সে আমাকে মানিয়া লইবে এবং তাহার কল্যান হইবে। কিন্তু যাহার অন্তরে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ আছে তাহার পক্ষে আমার কথার উপকার পাওয়া সম্ভব নহে।" ('তবলীগে হক' (আহবান) পুস্তক পৃ. ৪৯)

**সত্য-সন্ধানীদের প্রতি উদাত্ত আহবান**

* প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত আহমদ (আ.) ঘোষণা করেছেনঃ "খোদাতা'লাকে এক, অদ্বিতীয় মানো এবং সেই সাথে রেসালাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপরও ঈমান আনো। এই কারণেই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"– এই কথার দ্বারা ইসলামী-শিক্ষার সার-সংক্ষেপে বিষয়টি সকল উম্মতকে শেখানো হয়েছে" (হাকীকাতুল ওহী)।

* হযরত আহমদ (আ.) বলেছেন: "খোদা তা'লা আমাকে বার বার জানিয়েছেন যে, তিনি আমাকে বহু সম্মানে ভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসারীগণের জামা'তকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করবেন এবং তাদেরকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে যে, তারা নিজ নিজ সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করে দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সংঘ ফল-ফুলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধমান হবে এবং অচিরেই সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা–বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে। কিন্তু খোদা সেগুলোকে পথ হতে অপসারিত করে দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা ২২)

হযরত আহমদ (আ.) তাঁর লিখিত ৮৮ খানা পুস্তকের প্রত্যেকটিতে ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব জোরালো ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম-বহির্ভূত এবং পবিত্র কুরআন-অসমর্থিত কোন বিষয়ই তিনি প্রচার করেন নাই। যে সকল রহস্য বহুকাল পর্যন্ত উদঘাটিত ছিল না, ঐশী সাহায্যে তিনি সেই সকল রূপকাবৃত্ত বিষয়গুলোর প্রকৃত তাৎপর্য এবং সঠিক ব্যাখ্যা হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। প্রশ্ন হলো: তাঁর দাবীর সঠিক মূল্যায়ন করা উচিৎ নয় কি? কাট-ছাট করা উদ্ধৃতি পড়েই হৈ-চৈ করা হয় কেন? আবারো আহবান জানাচ্ছি: সত্য-সন্ধানীগণ আলোচ্য বিষয়গুলো তূলনামূলকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতঃ রাতকে রাত এবং দিনকে দিন বলতে সৎসাহস দেখাতে পারবেন কি?

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! তোমরা ভেবে দেখ, ইহাই কি সেই সময় নহে, যখন ইসলামের জন্য আসমানী সাহায্যের আবশ্যকতা অনূভুত হচ্ছে?" (আয়ানায়ে কামালাতে ইসলাম, ২৫১ পৃ.)

তিনি বলেছেন: "চতুর্দিকে প্রচারকার্য করাই আজ আমাদের কাজ। যার ফিতরাত নেক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্বভাব, সে পরিশেষে আমাদের আহবানে সাড়া দিবেই"। (দুররে সমীন)

[চলবে]

# নামায আদায় প্রশান্তি লাভের উপায়

**মাহমুদ আহমদ সুমন**

গত ২ ডিসেম্বর ২০১৭, ১২ রবিউল আউয়াল, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বকশীবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আতফালদের দিনব্যাপী অর্থসহ নামায শিক্ষা ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে প্রায় ৪০জনের ওপরে আতফাল অংশ নেয়। বিভিন্ন শিক্ষকদের সাথে খাকসারও ক্লাস নেয়ার সুযোগ হয়েছিল, আলহামদুলিল্লাহ। ক্লাস নিতে গিয়ে দেখলাম আল্লাহর ফযলে আহমদী সন্তানরা নামাযের দোয়াগুলো তো পারেই, অনেকে অর্থসহও পারে। নিয়মিত তারা নামায আদায় করে কি না জানতে চাইলে তারা বলে যে, হ্যাঁ, আমরা নিয়মিত নামায পড়ি। কেন নামায পড়ে, এটি জানতে চাইলে বলে আল্লাহ বলেছেন নামায আদায় করার জন্য, তাই নামায পড়ি, আর নামায পড়ে আমরা আনন্দ এবং প্রশান্তি পাই। ছোট ছোট শিশুদের মুখে এ ধরণের উত্তর শুনে বেশ ভাল লাগল। অথচ আহমদীদের সম্পর্কে এমনও আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, তারা নাকি নামায পড়ে না। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি অপবাদ। মূলত আহমদীরা শুধু প্রথাগত নামায পড়ে না বরং নামাযের দোয়াগুলোর অর্থ বুঝে নামায আদায় করে আর নামায পড়ে লাভ করে আত্মার প্রশান্তি।

একটি গাছের শেকড় যেমনটি তার পত্র পল্লবে ছড়িয়ে দেয় প্রাণ, শক্তি ও সৌন্দর্য; ঠিক তেমনি মানবদেহে রক্ষিত হৃদয় থেকে উৎসারিত শক্তিতেই পরিচালিত হয় তার চোখ, কান, হাত, পাসহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মানুষের হৃদয়গভীরে যখন হিংস্রতা বাসা বেঁধে ঠিকানা গড়ে তোলে, তখনই মানুষের হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ লিপ্ত হয় হিংস্রতায়। এমনই হাজারো হিংস্র হৃদয়ের মানুষের বসবাস ছিল আরবের মরুর বুকে। সেই সব পশুতুল্য ও হিংস্র মানুষদের ভিড়ে শান্তির সুবাতাস বয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রেরিত হলেন বিশ্বনবী, খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম। তিনি এলেন এবং হিংস্র হৃদয়গুলোর প্রতি আদরে ছুঁড়ে মারলেন শান্তির বাণী, সম্প্রীতির বাণী। প্রতিমুহূর্তে তিনি বাধাগ্রস্থ হলেন, তবুও তিনি থামলেন না। ছড়াতে থাকলেন সুবাস। হিংস্র হৃদয়ের দু'চারজনকে সত্যের পথে আনতে সক্ষম হলেন। তাদেরকে কালেমা পড়ালেন। এর পরেই নির্দেশ দিলেন 'তোমরা নামায আদায় করো'। একি? নামাযে দাঁড়িয়ে হিংস্র মানবদের দানবীয় মনটা যেন গলিত মোমের ন্যায় বিগলিত হতে আরম্ভ করলো। ক্ষিপ্রমান মানুষগুলোর এ কী হলো? তারা অঝোরে কাঁদছে কেন? ওরা অনুতপ্ত হতে আরম্ভ করলো। নামায ওদের বদলে দিতে সক্ষম হলো। এভাবেই মানুষ যখন নামাযে দাঁড়িয়ে তার তনুমন মহান প্রভুর দরবারে অবনত করে, তখন আরশ থেকে তার হৃদয়ে চুয়ে চুয়ে পড়ে শান্তির ফোটা ফোটা অমীয় সুধা। মহানবী (সা.)-এর দাওয়াতের ধারাবাহিকতা ও প্রচেষ্টায় যারাই ইসলামের ছায়াতলে এলো, বিশ্বনবী (সা.) তাকে কালেমা পড়ালেন এবং সর্বপ্রথম নির্দেশ দিলেন নামাযের। এভাবে দলে দলে অমানুষেরা ইসলামের ছায়াতলে অবস্থান নিল এবং নামাযের মাধ্যমে নিজেকে মহান প্রভুর সামনে বিলীন করে দিয়ে হৃদয়ে সমাগম ঘটালো ঝলমলে তারার। পশুতুল্য আরবেরা হয়ে উঠলো বিশ্ব শান্তির প্রতিক। ধীরে ধীরে আরবের পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সব সন্মানিত মানুষেরা ছড়িয়ে পড়লেন দুনিয়াজুড়ে। শান্তির পসড়া সাজিয়ে তারা যেখানেই বসে পড়লেন সেখানেই গড়ে উঠলো ঐতিহাসিক মসজিদ। গড়ে উঠলো নামাযের বিশাল বিশাল জামা'ত। আজকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমেও বিশ্বের ২১০টি দেশে হাজার হাজার মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। সেসব মসজিদগুলোতে এক আল্লাহর ইবাদতে রত তারা যারা এক সময়ে মূর্তি পূজায় মত্ত থাকত। নামাযই আজকে তাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করছে।

আসলে নামায এমন এক ইবাদত, যা না করলে প্রকৃত এক মুমিন কখনো প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। মাছ যেমন পানি ছাড়া থাকতে পারে না, তেমনি মুমিন নামায ছাড়া থাকতে পারে না। যুগে যুগে আগত নবী-রসূলগণ সর্বদা তার জাতিকে এক খোদার ইবাদত এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার কথা বলতেন। যেমন হযরত নূহ (আ.) তার জামাতকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলেছিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আল মুমিনুনের ২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?' নামায হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। সুতরাং নামায কায়েমের ব্যাপারে আমাদেরকে বিস্তারিত জানতে হবে। তা না হলে আমরা সঠিক নামায প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো না।

মহান আল্লাহ তা'লা বলেছেন, 'ওয়া আকিমুসসালাতা' অর্থাৎ, আর তোমরা নামায কায়েম কর (সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৪) নামাজের বিধিবদ্ধ সকল শর্ত পূর্ণভাবে পালন করেই নামায আদায় কর। 'আকামা' শব্দের অর্থ 'সে বিষয়টা বা বস্তুটাকে সঠিকভাবে সঠিক স্থানে রাখালো'। আল্লাহ তা'লার সাথে মানুষের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বহি:প্রকাশের নাম ইবাদত। আল্লাহর অনুগ্রহ মানুষের দেহ, মন ও আত্মাকে ঘিরে রেখেছে। অতএব পরিপূর্ণ ইবাদত তা-ই, যার মাঝে দেহ ও আত্মা সমভাবে অংশগ্রহণ করে। উভয়ের অংশগ্রহণ ছাড়া ইবাদতের চেতনা ও সারবস্তু সুরক্ষিত থাকতে পারে না। কেননা, যদিও হৃদয়ের নিবেদনই মূল বিষয় এবং শারীরিক ইবাদত বা উপাসনা খোলস মাত্র, তথাপি খোলস বা আবরণ ছাড়া সার বস্তু সংরক্ষিত হতে পরে না। খোলস নষ্ট হলে সারবস্তুও নষ্ট হয়ে যায়।

নামায কায়েম করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বার বার নির্দেশ দান করা হয়েছে। এছাড়া মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহপাকের ইবাদত করা। সূরা ইবরাহিমের ৩২ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেন, 'আমার যেসব বান্দা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, একা একা কখনও নামায প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সম্মিলিতভাবে বাজামাত নামায আদায়ের মাধ্যমে নামাযকে কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি বিশেষ কোনো কারণে মসজিদে গিয়ে বাজামাত নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঘরে সবাই মিলে বাজামাত নামায আদায়ের ব্যবস্থা

করতে হবে।

এছাড়া নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, 'নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায (আদায় করা) মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য' (সূরা আন নেসা, আয়াত: ১০৪)। দৈনিক পাঁচবারের যে নামায, তা যথাসময়ে আদায় করা খুবই উত্তম। যদি কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করতে অসুবিধা হয়, বা আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে তা অন্য সময়ে অবশ্যই আদায় করতে হবে। কেননা, কোনো অবস্থাতেই নামায মাফ করা হয় না। এমনকি নামাজের কোন কাফফারা নেই, যার মাধ্যমে নামাজের কমতি দূর হতে পারে! সুতরাং প্রত্যেক নামাজিকে তার নামায সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোন নামায ছুটে না যায়। মুত্তাকিরা সর্বদা নামায কায়েম করে থাকে। কোন কারণে নামায আদায় করা না হলে তার মাঝে অস্থিরতা কাজ করে থাকে। মনে হয়, কি যেন তার বাদ পড়ে গেছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন, 'ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার' অর্থাৎ 'নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে' (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৬)। এ বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা বলো তো দেখি! কারো ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, 'না, ময়লা থাকতে পারে না'। তিনি (সা.) বললেন, পাঁচওয়াক্ত নামাযও তদ্রূপ। আল্লাহ তা'লা এ দ্বারা সমস্ত দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন' (সহি বোখারি)।

উপরোক্ত হাদিসে আল্লাহর রসূল (সা.) আমাদেরকে পাঁচওয়াক্ত নামাজের তাৎপর্য বর্ণনা করে নামাজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, প্রকৃত নামায মানুষকে অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন- প্রকৃত নামায আদায় করলে আল্লাহ তা'লা আমাদের দোষত্রুটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন।

আল্লাহ তা'লা ও তার রসূল (সা.) এর এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই নামাযে গাফেল, আবার অনেকে এমনও আছে, যারা নামাযও পড়ে আবার নানা অশ্লীল এবং মন্দ কাজেও লিপ্ত থাকে। প্রকৃত নামায আদায়কারী কখনও মন্দকর্মে লিপ্ত হতে পারে না, এটাই আল্লাহপাকের ফয়সালা। আল্লাহপাকের দেয়া এই মাপকাঠিতে যেভাবে বলা হয়েছে যে, দৈনিক পাঁচবেলা গোসল করলে শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না, সেভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে আমরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি তাহলে আমাদের হৃদয়ে পাপের কোন ছাপ থাকতে পারে না। প্রকৃত নামায সম্বন্ধে আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, নামায এভাবে আদায় করো, যেন তোমরা আল্লাহকে দেখছো, আর এরূপ না হলে অন্ততঃ এতটুকো ভাবো যে, আল্লাহ তা'লা তোমাকে দেখছেন। আমরা যদি এমনভাবে ধ্যান মগ্ন হয়ে নামায আদায় করি, তাহলে আমরা প্রকৃত-নামাজি হতে পারবো।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্বাপোর করে বলেছেন- "যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না, সে আমার জামা'ত ভূক্ত নয়" (কিশতিয়ে নূহ)। তিনি (আ.) আরো বলেন, "মু'মিনের আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রথম সোপান হলো সেই বিনয়, সেই কাকুতি-মিনতি এবং সেই কাতরচিত্ততা, যা নামায এবং খোদা তা'লার স্মরণে এক মু'মিনের লাভ হয়। অর্থাৎ হৃদয় বিগলিত হওয়া, বিনয়, খোদার সাথে বিনম্র বাক্যালাপ, আত্মার বিনীত ক্রন্দন, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা আর এক ধরনের ভালবাসার উত্তাপ নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। আর ভীতিকর এক অবস্থা নিজের ওপর আনয়ন করে আল্লাহ্ তা'লার সামনে নিজের হৃদয় বা আত্মাকে সমর্পিত করা" (বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খণ্ড) তিনি (আ.) অন্যত্রে বলেন, "নামায থেকে যে ব্যক্তি ছুটি নিতে চায়, পশুর চেয়ে ভাল আর কী কাজ সে করেছে?" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৪)। শুধু বাজামাত নামাযের প্রতিই তিনি আমাদেরকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি বরং তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেভাবে তিনি (আ.) বলেছেন: "আমাদের জামা'তের উচিত, তারা যেন তাহাজ্জুদের নামাযকে আবশ্যকীয় করে নেয়। যারা বেশী পড়তে পারে না তারা দুই রাকাতই পড়ে নিক, কেননা এতে সে অবশ্যই দোয়ার সুযোগ লাভ করবে। এ সময়কার দোয়ায় বিশেষ এক প্রভাব ও কার্যকারিতা রয়েছে" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫)।

কীভাবে নামাযে স্বাদ ও রুচি লাভ হতে পারে, এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে দেখছো যে আমি কেমন অনদ ও দৃষ্টিহীন আর আমি এখন পুরোপুরি মৃতাবস্থায় পতিত। আমি জানি যে স্বল্পকাল পরই আমার ডাক আসলে আমি তোমার সকাশে এসে যাবো। সেকালে কেউ আমাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না কিন্তু আমার অন্তরাত্মা দ্যুতিহীন অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তুমি এমন জ্যোতির্ময় আলোকে রশ্মি এর ওপর সম্পাতিত করো যেন তাতে তোমার অনুসরণপূর্ণ ভালবাসার উন্মেষ ঘটে। তুমি আমার ওপর করুণা বর্ষণ করো যেন আমি দৃষ্টিহীন অবস্থায় উত্থিত হয়ে অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়ি। এ ধরনের দোয়া যাচনায় লেগে থেকে স্থায়িত্ব লাভ হলে পর দোয়াকারী তার এমন এক মুহূর্তের আগমন প্রত্যক্ষ করবে যে স্বাদ ও রুচিহীন ওই নামাযে আকাশ থেকে এমন একটা কিছুর অবতরণ ঘটবে যা রুচিকর সুপ্রিয় সুমিষ্ট স্বাদ সৃষ্টি করে দেবে" (মালফুযাত ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬১, নব সংস্করণ)

২০০৩ সালের ইংল্যান্ডের জলসা সালানার সমাপ্তি ভাষনে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আ.) নামায আদায়ে আমরা যেন নিয়মনিষ্ঠ হই এ জন্য তাগিদ প্রদান করেন এবং বয়আত গ্রহণের তৃতীয় শর্তের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: "বয়আত গ্রহণের এই শর্তে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে নামায তো এমনই এক বিষয় যে, আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্তের নামায বিনা ব্যতিক্রমে আদায় করবে।....পুরুষদের জন্য এ নির্দেশ রয়েছে যে জামা'তের (বা-জামা'ত) সাথে নামায আদায়ের বন্দোবস্ত করো, মসজিদে যাও আর তা জনকীর্ণ করে রাখো, এর আশিস অন্বেষণ করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। তবে ভ্রমণকালে কিছুটা ছাড় তো রয়েছেই আর রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও ছাড় আছে আর বলা হয়েছে যে 'জমা' করে নাও–'কসর' পড়ো অধিকন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় মসজিদে না যাওয়ার যে ছাড়টি রয়েছে তা থেকে ধারণা হয়ে যাওয়া উচিত যে বা-জামা'ত নামায আদায় করার তাৎপর্য কতটা ব্যাপক।"

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে সঠিক সময়ে এবং নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

# আমি কিভাবে আহমদী হলাম

**মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী**
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১২তম কিস্তি)

মির্যা সাহেব পেশায় একজন উকিল ছিলেন। পাগড়ি এবং লম্বা কোট পরতেন। সে সময় প্রত্যেক জেলায় একজন 'মুরব্বী ইনচার্জ জেলা' ছিলেন। দীর্ঘ দিন থেকে জেলা সারগোধার জন্য মৌলভী আযিযুর রহমান মাংলা সাহেব 'মুরব্বী ইনর্চাজ'-ছিলেন। তিনি বুযুর্গ আলেম সাদা সিধে সহজ সরল গ্রামীণ জীবন যাপন করতেন। অনেক সময় পাঞ্জাবী গ্রামীন পোশাক পরেই সফর করতেন। তৌহিদের প্রশ্নে উন্মুক্ত তরবারির মতো ছিলেন। আরবী ভাষায় কবিতা লিখতে পারতেন। এক পীর সাহেবের নায়েব বা সহকারী ছিলেন। পীর সাহেব মারা গেলে মাংলা সাহেব পীরের গদীতে বসবার কথা ছিল। তাঁর আহমদী হওয়াতে তাঁর পীর সাহেব বড় হতাশ হয়েছিলেন।

মৌলভী আযিযুর রহমান মাংলা আমাকে খুব আদর করতেন। তা'লীম, তরবীয়ত দিতেন। আমি ছোট ছিলাম শিখতে আগ্রহ রাখতাম। আমার এটি প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল। খুব দোয়া করতাম যেন সফলতা লাভ করি। এ জামাতে আমিই প্রথম মুরুব্বী ছিলাম। আস্তে আস্তে বেদারী (জাগরণ) আসতে লাগল। সকালে ফজরের পরে কুরআন আর বাদ মাগরিব তিন দিন হাদীস এবং তিন দিন মলফুযাতের দরস দিতাম। দরসের পরে কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলত। রমযান মাসে আসরের পরে কুরআন শরিফের দরস দিতাম। সকাল ১০টায় লাজনা মা বোনদের জন্য আবার দরসে কুরআন দিতাম। রমযান মাসের পরে দেখলাম মহিলাদের মধ্যে বেদারী দেখা দিয়েছে। এর খুব ভাল প্রভাব আতফাল, নাসেরাত, খোদ্দাম সবার মাঝেই দেখা গেল।

উপরন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমাকে বললেন, "আপনার জামাতকে আমার সাথে দেখা করতে নিয়ে আসুন।" আমি এসে জামাতকে বললাম। জামাতের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নির্ধারিত তারিখে সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলেন। পরিস্কার জামা কাপড় পরে বিশেষ বাস রিজার্ভ করে আমরা হুযূর (রাহে.)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। সবাই বড় হলঘরে কার্পেটের উপরে বসলেন। হুযূর (রাহে.)-এর একপাশে প্রেসিডেন্ট সাহেব অন্য পাশে খাকসার চেয়ারে বসলাম। হুযূর খুব খোলামেলা কথা বললেন।

হুযূরের (রাহে.)-এর সাথে এ মুলাকাতে জামাতের মাঝে পুরোপুরি জাগরণ এসে গেল। আলহামদুল্লিলাহ। মুলাকাত চলাকালে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। হুযূর সবার সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "বিয়ের জন্য বেশী লেখাপড়া জানা মেয়ে হওয়া তো জরুরী হয় না।" তার পরে আবার জামাতের সাথে কথা বলতে থাকলেন। আমি আশ্চর্য হলাম যে, কোন প্রসঙ্গ ছাড়া হুযূর (রাহে.) আমাকে এমন কথা বললেন। এই জামাতেই আমি কর্মরত ছিলাম। বিয়ের জন্য আমার বাংলাদেশে আসার জন্য ভিসার চেষ্টা চলছিল। অবশেষে ডিসেম্বর (১৯৭৭) মাসে আমার বাংলাদেশে আসার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আমি যখন মুরব্বী হিসাবে কর্মস্থলে যোগ দিলাম তখন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মোহতরম মালেক সাইফুর রহমান, প্রিন্সিপাল জামেয়া আমাকে বললেন, আমি যদি পাকিস্তানে বিয়ে করতে চাই তাহলে আমার বিয়ের জন্য ভাল মেয়ের প্রস্তাব আছে। আমি যেন হযরত সাহেবের (রাহে.) এর খেদমতে হাজির হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করি। আমি হুযূরের (রাহে.) খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু হুযূর (রাহে.) বললেন, আমাকে বাংলাদেশে বিয়ে করতে হবে। আমি আমার শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা বললাম। হুযূর বললেন, 'না আপনাকে বাংলাদেশ গিয়ে বিয়ে করতে হবে।'

বাংলাদেশে আসার পূর্বে হুযূরের (আই.)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। বিয়ের ব্যাপারে বাংলাদেশের মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ মহিব্বুল্লাহ্ সাহেবের ছোট মেয়ের সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব পূর্বেই হুযূরের খেদমতে লেখা হয়েছিল। আমি হুযূরের অনুমতি চাইলাম। প্রথমে হুযূর ঠাট্টা করলেন, 'তোমাকে তো কেউ মেয়ে দিতে চায় না।' আমি বর্তমান প্রস্তাবের কথা বললাম, একটু থেমে হুযূর বললেন, 'ঠিক আছে।'

হুযূর এ জন্য ঠাট্টা করলেন যে, ইতিপূর্বে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আমার দোয়া ছিল, আল্লাহ্ যেখানে চান সেখানে হবে। একজন বিশেষ ব্যক্তি নিজেই নিজের মেয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তারপর না করে দিলেন। বাংলাদেশে এসে মোহতরম আমীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে চরদুখিয়া (চাঁদপুর) গেলাম। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ শনিবার মোহতরম মওলানা মুহিবুল্লাহ্ সাহেবের ছোট মেয়ে আমাতুল কুদ্দুস

শাহানার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মনে পড়ল ঐ মুলাকাতে হুযূর যে বলেছিলেন, "বিয়ের জন্য বেশী লেখাপড়া জানা মেয়ে হওয়া জরুরী হয় না।"

মওলানা মহিবুল্লাহ্ সাহেব আহমদীয়াতের পূর্বেই আলেম ছিলেন। বিশেষ করে হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের তবলিগে ১৯৪৩ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আহমদী হয়ে কাদিয়ান গেলেন। কাদিয়ান দারুল আমান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জন্ম স্থান এবং বাসস্থান। এখানেই তিনি সকল ঐশী বরকত ও কল্যাণ লাভ করেছিলেন। হযরত (আ.) এর ইন্তেকালের পরে এখানেই খেলাফতের ঐশী ব্যবস্থা প্রকাশিত এবং স্থাপিত হয়েছিল।

মওলানা মুহিবুল্লাহ্ সাহেব কাদিয়ান গিয়ে কাদিয়ান দেখে বিমোহিত হয়ে জীবন উৎসর্গ করলেন। অতএব, জামাতের ব্যবস্থাপনায় মোবাল্লেগ ট্রেনিং নিতে থাকলেন। মওলানা মহিবুল্লাহ সাহেবের প্রথম বিয়ের ১২ বছর পরও কোন সন্তান লাভ হয় নি। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে আবেদন করলেন মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করতে চান। প্রথমতঃ মওলানা যিল্লুর রহমান রাজি হচ্ছিলেন না। পরে হযরত সাহেবের কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এভাবে মওলানা মহিবুল্লাহ্ সাহেব মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের বড় মেয়ে হাবিবা রাহাত সাহেবার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার পরে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে প্রথম সন্তান মওলানা মাহমুদ আহমদ (মুরব্বী সিলসিলাহ্) জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের বড় মেয়ে হাবিবা রাহাতের ছোট মেয়ে আমাতুল কুদ্দুস শাহানার সাথে আমার বিয়ে হল। আল্লাহর ইচ্ছা, আমি একা আহমদী ছিলাম, বাড়ী থেকে বহিস্কৃত ছিলাম। ভাই বোন কেউ আমার সাথে ছিলেন না। এখন আমার বিয়ের ফলে অনেক আত্মীয় স্বজন পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের পরে প্রায় দু'মাস বাংলাদেশে ছিলাম। তারপর কর্মস্থল চক নং ৪৬ শমালীতে যোগ দিলাম।

মওলানা মহিবুল্লাহ্ সাহেব ১৯৪৬ সনে মোবাল্লেগ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশে আসলেন। মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বাংলাদেশে মোবাল্লেগ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ কাদিয়ানে থাকতেন। ১৯৪৭ সনে দেশ ভাগ হয়ে গেল, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কাদিয়ান থেকে হিজরত করে প্রথমে লাহোর পরে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হলেন। মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের পরিবার চিনিউটে ভাড়া বাড়িতে থাকতে লাগলেন। মওলানা সাহেবের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে মেয়েরা হুযূরের (রা.)-এর পরামর্শে বাংলাদেশে চলে আসলেন। কেবল মেঝ ছেলে মুজিবুর রহমান (এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব) পাকিস্তানে থেকে গেলেন।

আমি তো বিয়ের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে প্রায় দু'মাস থেকে অনেক মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত করলাম। অনেক কথা শুনলাম। আমার মাথায় কিছু প্রস্তাব আসল। মনে হল হুযুর (রাহে.)-এর কাছে বলা দরকার। বাংলাদেশ থেকে ফেরত গিয়ে প্রস্তাবগুলো সুন্দর করে কাগজে লিখে হুযুরের খেদমতে দেখা করতে গেলাম। মুলাকাতে মৌখিক এসব কথা বলার সুযোগ হবে না, তাই লিখে নিয়ে গেলাম। হুযুরের খেদমতে হাজির হলাম। হুযুর বললেন, আজ সময় কম, আগামীকাল অফিসে এসে দেখা কর। পরদিন হুযুরের অফিসে গেলাম। এই প্রথম হুযুরের অফিসে তথা অফিসিয়াল মুলাকাত করলাম। সাধারণ দেখা সাক্ষাত অন্য রকম হয়। অফিসিয়াল মুলাকাত অন্য রকম। হুযুরের খেদমতে আমার লেখা রিপোর্ট এবং প্রস্তাবগুলো রাখলাম। হুযুর পুরোটা পড়লেন। তারপরে বললেন, ঠিক আছে। আমি চলে আসলাম। পরে জানলাম আমার লেখাটি হুযুর নাযের সাহেব এসলাহ ও এরশাদ মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কাছে পাঠিয়েছেন।

তারপর জানতে পারলাম তখনই আমার দুটি প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছে। একটি প্রস্তাব অনুসারে বাংলাদেশে জলসার সময় হুযুর (রাহে.)-এর পক্ষ থেকে প্রতি বছর তিনজন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসবেন। জলসায় অংশ নিবেন। এবং সকলের সাথে দেখা করবেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে বাংলাদেশ থেকে ছাত্ররা জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় পড়তে যাবে এবং মোবাল্লেগ হয়ে ফেরত আসবে। প্রথমে দুজন গিয়েছিলো। একজনের বয়স বেশী থাকায় ভর্তি করা হয়নি। অপরজন কিছুকাল জামেয়ায় পড়াশোনা করেছে। কিন্তু পরে জামেয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর এক এক করে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা ফিরোজ আলম গিয়ে জামেয়ায় ভর্তি হলেন এবং সুনামের সাথে জামেয়া পাশ করে মোবাল্লেগ হয়ে দেশে ফেরত আসলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সম্ভবত: ১৯৮০ সাল থেকে মরকেযি আলেমগণ জলসা সালানা বাংলাদেশে অংশগ্রহণ আরম্ভ করেছিলেন। ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে যারা এসেছিলেন তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে পাকিস্তানে যারা বাঙ্গালী মোবাল্লেগ কর্মরত ছিলেন তাদের বাংলাদেশে আসা আরম্ভ হয়। প্রথমে মওলানা আনিসুর রহমান, তারপর মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব বাংলাদেশে আসেন। তারপর আমি এসেছিলাম।

আমি বিয়ের পরে ফেরত গিয়ে চক ৪৬ শমালী গিয়ে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ি। সাধারন নিয়ম অনুসারে একবছর পর আবার নতুন করে মুরুব্বীদের কর্মস্থল পরিবর্তন করে অন্য কোন জামাতে পাঠানো হয়। অনেককে নাযের এসলাহ ও এরশাদ মরকেযিয়া দপ্তরে পাঠানো হয়। আমাকেও মরকেযিয়ায় পাঠান হল। তারপর আমাকে ১৯৭৮ সনে জুলাই মাসে ভাওয়ালপুর শহরে পাঠানো হয়। এটি একটি ডিভিশনাল শহর। ভাওয়ালপুর জেলার জন্য তিনজন মুরুব্বী নিয়োগ দেয়া হত। আমার পূর্বে সেখানে মওলানা মালেক মনসুর আহমদ ওমর সাহেব এবং মওলানা ওয়াসিম আহমদ চিমা সাহেব সেখানে অবস্থান করছিলেন। ভাওয়ালপুর জেলার তিনটি উপজেলার জন্য তিনজন মুরুব্বী। সবাই শহরের একটি বিল্ডিং এর তিনটি বাসায় অবস্থান করেন। তিন উপজেলার জন্য তিন জন মুরুব্বী।

আমরা নিজ নিজ উপজেলার জামাতগুলোর দেখাশোনা করতাম। নিজ নিজ জামাতগুলোতে সফর করতাম। ভাওয়ালপুর শহরের দুটি হালকায় আমরা পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করতাম। আসর অথবা মাগরীবের পর হালকাগুলোতে আমরা যেতাম। নামাযের পর দরস ও তরবিয়তী কার্যক্রম থাকত।

(চলবে)

# ভুল শুধরাতে ভুলের আশ্রয়

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হলেন আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ। অথচ সাধারণ মুসলমান তথা অ-আহমদীগণ তাদের অবহেলা, অমনোযোগ, ঈর্ষাদম্ভ ও গায়ের জোরে (জ্ঞানের জোরে নয়) তাঁর বিরোধিতায় মেতে তাঁকে গ্রহণ করে নিচ্ছেনা। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ভুলে গেছে। ঐশী জগতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে। বলতে কী তাদের দ্বারা সাধিত চরম এ ভুলকে শুদ্ধ প্রমাণিত করার প্রয়াসে তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আরো আরো ভুলকে সংযোজন করে নিজেদেরকে শুদ্ধ বিবেচিত করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ একটি ভুলকে বৈধতা দিতে আরো কিছু ভুলের সহায়তা নিচ্ছে।

প্রথমেই বলতে হয়– যখন পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর ৪নং আয়াত নাযেল হলো অর্থাৎ, "এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্যে হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সাথে মিলিত হয় নাই" তখন উপস্থিত সাহাবাগণ তাঁকে (সা.) প্রশ্ন করলেন। "হে আল্লাহ্‌র রসূল! কারা (যারা কিনা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয় নাই)"? এ প্রশ্ন তিনবার করার পর রসূল পাক (সা.) তাঁর একজন বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান পারশী (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায় তথাপিও তাদের (পারশ্য বংশোদ্ভুত) এক বা একাধিক ব্যক্তি একে তথা হতে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবে। এর ফলে নবুওয়্যতের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহদী মাশহুদ ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের পর পুনরায় পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে" (বুখারী)। যখন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সাদরে অ-আহমদী ভাইদের কাছে কুরআন করীমের এ আয়াত (৬২ঃ৪) ও সুবিখ্যাত এ হাদীসটি উপস্থান করা হয় তখনই তারা সরগরমে সচিৎকারে বলে, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পর তো ইসলামে আর কোন প্রকারের নবীই আসবে না। আমাদের নবী (সা.)-এর শান ও মর্যাদা এতটাই ব্যাপক যে, তাঁর তিরোধানের পর তাঁর রেখে যাওয়া ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর কোন নবী আগমনের প্রয়োজন নেই।" এই হলো ধর্ম বিশ্বাসে সে ভাইদের প্রথম নম্বর ভুল।

কিছুটা শান্ত করে যখন তাকে বলা হয়, ভাইজান! নবী তো হলো মানুষকে প্রদত্ত খোদার পক্ষের একটি বিশেষ নিয়ামত। এ নিয়ামত আমরা পাব না, খোদা আর আমাদেরকে দিবেন না এটা কেমন কথা! অন্যান্য সাধারণ নবীর উম্মত এ নিয়ামতের ভাগীদার হয়েছেন আর আমরা আকাশের মহামর্যাদাবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও সে নিয়ামত প্রাপ্য হবো না এথেকে বঞ্চিত থাকব তা কেমন কথা? আপনি কীভাবে এমন কল্যাণময় দান পাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত থাকার কথা ভাবছেন? এতে করে ইসলাম ধর্মকে খুব ছোট মনে হয়না কী?

এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, "আরে ভাই, আমরা বলব কেন? আমাদের নবীজী (সা.) স্বয়ং বলেছেন, "আমি খাতামান্নাবীঈন আমি রাহমাতুল্লিল আলামীন। আমার পর আর কোন নবী নাই, আমি শেষ নবী"। প্রিয় পাঠক! দেখুন তারা তাদের প্রথম ভুল বিশ্বাসটাকে অযৌক্তিকভাবে শুদ্ধ প্রমাণ করার প্রয়াসে এবার আরো একটি ভুলের আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ রসূল করীম (সা.) নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমিই শেষ নবী, আমার পর আর কোন প্রকারের নবীই নাই।" ইহা হলো সে ভাইদের ধর্মবিশ্বাসের আরো একটি ভুল অর্থাৎ দ্বিতীয় নম্বর ভুল।

যখন বললাম, ভাই সাহেব! নবীজী (সা.) বলেছেন, "আমাকে অনুসরণ ছাড়া আর কোন নবী নেই। পরবর্তীতে যিনি নবী হবেন তিনি আমাকে অনুসরণ করে আমার মধ্যে হতেই হবেন।" এর উত্তরে তারা বলেন, 'আপনি কী কুরআন করীমের এ আয়াত জানেন না? অর্থাৎ "মাকানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্মির রিযালিকুম ওয়ালা কির রাসূলাল্লাহে ওয়া

খাতামান নাবীঈন, মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নহেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী" (৩৩:৪১)। এর জবাবে বলা হলো, ভাই! খাতাম শব্দটি তো "খাতামা শব্দ হতে আসছে, যার অর্থ ছাপ বা আংটি। এর অর্থ শেষ এ কথা আপনি পেলেন কোথায়?" তখনই সে ভাই অগ্নি মেজাজে বলেন, "অবশ্যই এর অর্থ শেষ। আপনি ভাল জানেন না। নবী আসলে তো ওহীর প্রয়োজন হয়। এখন তো ওহীর দরজা বন্ধ।"

হায়! আবারো সেই একই ভুল। তাদের বিশ্বাসের এ হলো তৃতীয় ভুল। ওহীর দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসে তৃতীয় ভুলের আশ্রয় নিলেন। ধর্ম বিশ্বাসে তারা পর্যায়ক্রমেই ভুলের সাহায্য নিচ্ছেন। তবু তাদের দম্ভের কারণে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে উম্মতী নবী তথা ইমাম মাহ্‌দী বলে স্বীকার করে নিবেন না। তবে এখানেই তাদের ভুলের ইতি নয়, ভুল কিন্তু আরো আছে। চলুন আমরা আরো একটু এগিয়ে যাই। যখনই সে ভাইকে বুঝিয়ে বলা হয়, প্রিয় ভাই! ওহীর দরজা বন্ধ হয় কী করে? আল্লাহ্‌ কী মানুষের সাথে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিতে পারেন? তা হলে তিনি কার সাথে কথা বলবেন? মানুষ বিপদে-আপদে কীভাবে পথ চলবে? তাঁর সবগুণই তো অনাদি অনন্ত এবং চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। তাহলে তাঁর বাক্যালাপ গুণ কীকরে বিলুপ্ত হতে পারে? রসূল (সা.)-এর পর তো এ পৃথিবীতে লাখ লাখ ওলী আল্লাহ্‌, গাউছ কুতুব জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই খোদার বাক্যালাপে সিক্ত হওয়ার কথা দাবী করেছেন। তবে কী তাঁদের এ দাবী মিথ্যা? তাঁরা কী তাহলে মিথ্যাবাদী ছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ্‌)। এবার তিনি কিছুটা বেকায়দায় পড়লেন এবং পুনঃ আরো একটি ভুল তথ্য খুঁজে নিয়ে তার আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "দুনিয়ার সব মুসলমান জানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর পর আর কোন নবী নাই অথচ আপনারা গুটি কয় আহমদী (কাদিয়ানীরা) বলছেন, মির্যা গোলাম আহমদ নবী– তাকে মেনে নেয়ার জন্য। শান্তির ধর্মে আপনারা একটা বিতন্ডা বাধিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছেন। আর এখনো তো তার আসার সময় হয়নি এবং আসলেও তো তিনি নবী হবেন না বরং ইমাম হবেন।" নিশ্চয় ভাই, দুনিয়ার সব মুসলমানই ইহা ভুল জানে। তিনি নবী হবেন না ইমাম হবেন ইহাও আপনার আরেকটি ভুল।

উত্তরে বলা হলো, মুসলিম শরীফের হাদীসে তো তাঁকে ৪ বার নবীউল্লাহ্‌ বলা হয়েছে। তা হলে তিনি নবী হবেন না তো কী হবেন? তিনি বললেন, 'সব হাদীসই সঠিক নয়'। ইহা হলো তার ৫ম ভুল। ভাই সাহেব! আপনি আবারও সত্য হতে বিচ্যুত হচ্ছেন। যে হাদীস কুরআনকে সমর্থন করে তাকেও কী আপনি মিথ্যা হাদীস বলে জ্ঞান করবেন? এ বিষয়ের সব হাদীসই কুরআনের সপক্ষে কথা বলে। যেমন রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "ইবরাহীম (আমার ছেলে) যদি জীবিত থাকত তবে নিশ্চয় সে সত্যবাদী নবী হত" (মাজাহ)। আবু বকর সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন।" (কানযুল উম্মাল)। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেছেন, "তোমরা (সা.)কে খাতামাননাবীঈন বল, কিন্তু একথা বলো না যে তাঁর পরে আর কোন নবী নাই" (দূররে মনসুর)। এসব হাদীস থাকা সত্ত্বেও আমরা কি করে বলতে পারি যে রসূল (সা.)-এর পর আর কোন নবী নাই বা নবী আসবেন না? শুধু হাদীসই নয়, পবিত্র কুরআনও বলে, "এবং স্মরণ কর যখন আল্লাহ্‌ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (এই বলে) কিতাব ও হিকমত হতে আমি যা কিছু তোমাদেরকে দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে, যে সে বাণীর সত্যায়ণ করে যা তোমাদের নিকট আছে তখন তোমরা নিশ্চয় তার ওপর ইমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে....।" (৩:৮২)

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলি নিশ্চয় কুরআন করীমের এ আয়াতকে (৩ঃ৮২) দৃঢ়তার সাথে Support করে অর্থাৎ নবী আগমনের সত্যতাকে সতত স্বীকার করে। অথচ আপনি এ সত্যতাকে স্বীকার করছেন না। আপনি বলছেন নবী আগমনের পথ বন্ধ। স্বর্গীয় দূত মানুষের জন্য মহান খোদার সর্বশ্রেষ্ঠ দান নবী আগমনের বিষয়ে আপনার এতটা অনীহা কেন? অতি উত্তম জিনিসের প্রতি আপনার এতটা বিতৃষ্ণা কেন? কেন আপনি এতটা চেষ্টা করে নবী আগমনের পথকে বেড়া দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করছেন?

অকাট্য যুক্তির জালে ধরা পড়ে তিনি এবার পথহারা। এথেকে উদ্ধার লাভের চেষ্টায় তিনি আরো একটি ভুল তথ্যের অবতারণা করলেন। সেটি হলো– "ইমাম মাহদী আসলে তো হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে আসার কথা! তিনি তো ইমাম মাহ্‌দীর জন্য চৌথাকাশে জীবিত অপেক্ষা করছেন। আপনি বলছেন, ইমাম মাহ্‌দী এসে গেছেন কিন্তু ঈসা তো আসেন নি। সুতরাং তাঁকে আমরা সত্য মাহ্‌দী বলে মানব কী করে?" এ প্রেক্ষিতে তাকে বলা হলো– একি বলছেন ভাই! হযরত ঈসা কোথায় কীভাবে আছেন? তিনি সশরীরে ৪র্থ আকাশে কেন আছেন? অ-আহমদী সে ভাই বললেন, ইসলামকে পুনঃসংস্কারের জন্য যখন ইমাম মাহ্‌দী আসবেন তখন তাঁর সাহায্যে মূসায়ী মসীহও আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং ইমাম মাহ্‌দীকে ধর্মীয় কাজে সফলতা লাভে সহায়তা করবেন। সমস্ত বিশ্বে ইসলামই একমাত্র ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, একথা কী আপনি জানেন না? এবার তিনি তথ্যগত আরো একটি ভুল উপস্থাপন করলেন। এর জন্য আরো অনেক কথা বলতে হবে।

ভাই সাহেব! আজ থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে আগত হযরত ঈসা! তিনি তো মারা গিয়েছেন। মহান কুরআনের ৩০টি আয়াত তাঁর মৃত্যু প্রমাণ করে। আমাদের নবী (সা.) মেরাজের রাতে তাঁকে (ঈসাকে) অন্যান্য মৃত নবীর সাথে দ্বিতীয় আকাশে দেখেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন। অথচ আপনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) চতুর্থাকাশে সশরীরে জীবিত আছেন। আপনি তো এক্ষেত্রে ভুল করছেন। তিনি বললেন, "ভুল আমি করিনি বরং আপনিই করছেন। যখন ইহুদী মোল্লারা হযরত ঈসাকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করল, তখন মহান আল্লাহ্ তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন, 'হে ঈসা (তুমি ভয় পেয়ো না)! আমি তোমাকে মৃতু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উঠিয়ে নিব। তখন আল্লাহ্ তা-ই করলেন। তিনি ঈসার সদৃশ এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে ইহুদীদের সামনে দিলেন, তারা ঐ (নকল) ঈসাকেই ক্রুশে দিল আর আল্লাহ্ (আসল) ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। সেই থেকে হযরত ঈসা সশরীরে চৌথাকাশে অবস্থান করছেন। যখন ইসলামে ইমাম মাহ্দী জাহির হবেন, তখন তিনিও আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং মাহ্দীর সাথে ধর্ম সংস্কারের যুদ্ধ-লড়াইয়ে সাহায্য করবেন।"

তাকে বলা হলো ভাই! ইহা আপনার আরো একটি ভুল বিশ্বাস। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যদি মূসা ও ঈসা এখানো জীবিত থাকতেন তবে তারা অবশ্যই আমার অনুসরণ ও অনুগমন করতে বাধ্য হতেন" (ইবনে কাসীর)। ভাইজান! এ হাদীসটির অর্থ আপনি কীভাবে বুঝবেন? উত্তরে তিনি বললেন, "হাদীস ও কুরআনের বাণী কোন কোনটা রূপক। সরাসরি এর অর্থ করলে তা বুঝতে ভুল হতে পারে। রূপক অর্থে বুঝতে হবে। একে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে"।

আপনি বললেন, ইহুদীরা ঈসার সদৃশ এক ব্যক্তিকে ক্রুশে দিয়েছিল। তারা তো তখন 'সদৃশ' বুঝেনি, স্বয়ং ঈসাকেই ক্রুশে দিয়েছে বলে বিশ্বাস করেছেন। এর অর্থ তাহলে ঈসার মৃত্যু ক্রুশেই হয়েছে। সুতরাং অবশ্যই তিনি অভিশপ্ত! (নাউযুবিল্লাহ্) অতএব ইহুদীদের যে দাবী ঈসা মিথ্যাবাদী ছিলেন তাদের সে দাবীই তবে সত্য এবং তাদের ধর্ম বিশ্বাসও সত্য, তা নয় কি? আর আল্লাহ্ ঈসার সদৃশ একজন লোক বানিয়ে কেন ইহুদীদের ধোকা দিতে গেলেন? সে লোক কোন্ অপরাধে ক্রুশিফাই হলো? ইহুদীদের এভাবে ধোকা দেয়া কী আল্লাহ্র উচিত হয়েছে? মানুষকে ধোকা দেয়া কী আল্লাহ্র সাজে? তিনি তো মহান এবং মহা পবিত্র খোদা। তিনি ধোকার আশ্রয় নিবেন কেন? এক্ষেত্রে ভাই বললেন, 'এমনটি হওয়ার ছাড়া আর কী হওয়ার ছিল? যা হওয়ার তা-ই হয়েছে'।

আপনার কথা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও এখানে ইহুদীদেরকে ধোকা দেয়া ছাড়া তাঁর আর কোন গতি ছিল না? আপনার পদে পদে অনুরূপ ভুল ধারণার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আচ্ছা ভাই! আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন, "মুহাম্মদ একজন রসূল ব্যতীত আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বেকার সকল রসূল গত হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেছে)" (৩:১৪৫) এতে কী ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে না? হযরত ঈসা তো রসূল করীম (সা.)-এর পূর্বেকার নবী। তিনি জবাবে বললেন, "এ আয়াতের অর্থ সব রসূল না বলে বরং পড়তে হবে কতক রসূল মারা গিয়েছেন'। তবেই এ আয়াতের অর্থ যথার্থ হবে"। আপনি সুন্দর বলেছেন, এখন আপনার নিকট প্রশ্ন হলো, হযরত ঈসা ও মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝখানের সময়ে কী পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন হয়েছে বলে কী কুরআন হাদীসে প্রমাণ মিলে? তিনি বললেন, "পৃথিবীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর আগমন হয়েছে। কে কখন এসেছেন এবং কার কী নাম তা কী আমাদের সবার জানা? তাঁদের মাঝখানে আরো নবীর আগমন হয়ে থাকতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ভাই সাহেব! যথার্থ মন্তব্য ইহাই যে, হযরত ঈসা ও মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝখানের সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন হয়নি। ইসলামের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত ইহাই। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ সব রসূল করেন আর কতক রসূল করেন, যা-ই করেন না কেন এতে অবশ্যই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! যারা আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা করছেন তারা মোটেই ঠিক করছেন না। তারা ভুল করছেন, ভুলের মধ্যেই ডুবে আছেন মনে রাখবেন, সত্য খুবই সুন্দর। সত্য অনন্ত সত্য। আলোতেও সত্য অন্ধকারেও সত্য। গুড়ের স্বাদ অন্ধকারেও মিষ্টি। সত্য হলো শান্তি। অপ্রতিরোধ্য সত্য শত প্রতিকুলতায়ও দুর্বার গতিময়। সত্য খুবই সহজ ও প্রাঞ্জল। সত্য মধুময়। সত্যের বিপরীতেই যতসব অশান্তি। আহমদীয়া জামাত স্বর্গীয় সত্যের প্রস্তাব দিচ্ছে। যদি আপনারা এ সত্যের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করেন তবে আপনাদেরকে বাঁচার জন্য এমনি ধরণের শত ভুলের আশ্রয় নিতে হবে। পরিণামে বেঁচে থাকা তো সম্ভবই হবে না বরং মৃত্যুই হবে ললাট লিখন। আর সে মৃত্যু হবে কলংকের।' "এবং তারা যে কাজ করেছে তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্যাদা আছে, এটা এজন্য যেন তিনি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফলন দেন এবং তাদের ওপর কোন যুলুম করা হবে না"। (আল কুরআন ৪৬ঃ২০)

সুতরাং ভাইগণ! আর এলোমেলো ঘুরাফিরা নয়। সত্যাশ্রয়ে আসুন এবং মৃত্যোত্তর পরিণামকে সুমহান করার কাজে ব্রত হোন।

# দূর্গারামপুর জামা'তে সেবারত থাকাকালীন সময়ের স্মৃতিকথা

**শরীফ আহমদ আফ্রাদ**, মুরব্বী সিলসিলাহ্

জামেয়া পাশ করার পর গত ২০০৫ সালের জুলাই মাসে আমাকে সর্ব প্রথম দূর্গারামপুর জামা'তে পাঠানো হয়। ছাত্র জীবনের লেবাস, স্বভাব, আচার-আচরণ, চালচলন, মনোভাব মোটেই দূর হয়নি। ভাবতে ছিলাম কোথায় যাচ্ছি, কেমন পরিবেশে যাচ্ছি, আমি সে জামাতের সদস্যদের সাথে কীভাবে মিশব বা তাঁরা আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবেন ইত্যাদি বহুবিধ কল্পনা। ওয়াকফে জিন্দেগী, সুতরাং এতসব ভাবনার অবকাশ নেই। যেমন পরিবেশই হউক না কেন আমাকে সেখানে যেতেই হবে। মাটি কুড়ে গজিয়ে উঠা শিশু চারাটির মত আমার মন। কারো কটু কিংবা কঠোর কথা শুনলে তা আঘাত প্রাপ্ত হবে। ইত্যাকার এন্তার জল্পনা-কল্পনা নিয়ে দূর্গারামপুর জামা'তে পৌঁছলাম। গ্রামটি লম্বাকারের, তবে ছোট। গ্রামের তিন দিকেই পানি। পশ্চিমে মেঘনা নদী, দক্ষিণে মেঘনা ও তিতাসের মোহনা। পূর্বে ছোট এক নদী। বেশ মনোরম পরিবেশ। ইঞ্জিল চালিত নৌকা ও লঞ্চে ভৈরব ও নবীনগর উপজেলা সদরে যাতায়াত ব্যবস্থা। ছাত্র থেকে কর্ম জীবনে প্রবেশ। সাধারণ বেশে স্বল্প সম্বল সাথে করে তথায় পৌঁছলাম। দেখলাম স্থানীয় আহমদী সদস্য-সদস্যাগণ আমাকে আন্তরিকতার সাথে আপন করে নিতে শুরু করেছে। খুব কাছে নিতে চেষ্টা করছে। আমি তাঁদের অকৃত্রিম আপ্যায়ণে আপ্লুত হলাম। ক্রমেই মনের জড়তা কাটছে। অতঃপর দায়িত্ব পালনে নির্বিষ্ট হলাম।

তফাজ্জল হোসেন তথা জনাব খোকন ভইয়ের আম্মা একখানা চৌকি কাঁধে বহে এনে আমার থাকার গৃহে পেতে দিলেন। আনুসঙ্গিক ছোটখাট দ্রব্যাদি বালতি, মগ, গা-মাখা সাবান এক জোড়া স্যান্ডেল ইত্যাদি মমতা ভরা হস্তে আমার থাকার ঘরে পৌঁছে দিলেন। তাঁর আদর ভরা আপ্যায়ণে আমি বিমুগ্ধ হলাম। বেলাল ভাইয়ের আম্মা গায়ের রং কাল কিন্তু মুখে সরল হাসি আমার সকাশে এসে ভালবাসা বিনিময় করলেন এবং খাবার-খাদ্যের খবরা-খবর নিলেন। তাঁদের সহজ সরল আদরে আমি আস্তে আস্তে তাঁদের প্রতি নিবেদিত হতে লাগলাম। আমি তাঁর (বেলাল সাহেবের মাতা) হাসিভরা মুখের স্নেহ দেখে বলতাম, "জাতের মেয়ে কালও ভাল আর নদীর জল ঘোলাও ভাল।" তাতে নিজেকে তিনি বেশ গর্বিত মনে করতেন। বিনিময়ে তিনি আমাকে আরো আদর করতে সাগ্রহী হতেন।

জনাব ফজল-ই-ইলাহী সাহেবের মমতাময়ী মা বর্তমানে স্বর্গীয় এবং মুসীয়া, বেহেশতি মাকবেরায় তাঁর কদবা সংরক্ষিত আছে। তাঁর বুকভরা আদরের কথা মনে হলে এখনও চোখ ভরে কান্না আসে। তিনি এসে বললেন, "জনাব আমি খুব চা-প্রিয় মানুষ। ভাত না হলেও চলে। আপনার যখনই চা-পানের পিপাসা হবে তখনই আমার কাছে চলে আসবেন। সংকোচ করবেন না। ভাই-বোন মিলে সরল পরিবেশে চা পান করব। সাথে অন্য কিছুই থাকবে না। এসব অত্যন্ত উদার মনের কথা। যা হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

মরহুম (বর্তমানে) আবদুল মান্নান চৌধুরী জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহেব ও তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গও আমাকে অতীব আপন একজন মনে করে আদর করতেন, ভালবাসতেন। গ্রামের অ-আহমদী পুরুষ ও মহিলাগণও আমাকে বেশ সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। আমি এখন তাঁদের সবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তৎকালীন সময়ের জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. শরীয়ত উল্লাহ্‌র বাড়ী কিছুটা ফারাগে। তিনি প্রায়শঃ এসেই আমার খোঁজ-খবর নিতেন। দফেদার শুক্কু মিয়া বেশ দূর এলাকার একজন নিবেদিত সদস্য। তিনিও আমার প্রতি দরদী ছিলেন। বেলাল ভাই, ডা. তৌফিক-ই-ইলাহী ও জনাব মান্নান চৌধুরী সাহেবত্রয়ের আন্তরিকতা ছিল প্রচন্ড যা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে। এসব মায়াভরা স্মৃতি এখনও আমার অন্তরকে নাড়া দেয়। তাঁদের এ আদরের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ঋণী। এর জন্য তাঁদেরকে আমার দোয়া ছাড়া আর কিছুই দেয়ার নেই।

সকালে আহমদী শিশুরা ছাড়াও অ-আহমদী বাচ্চারাও আমার কাছে কুরআন পড়তে আসত। অ-আহমদী ৫/৭ জন যুবক তাদের বিভিন্ন কাজের পরামর্শ নেয়ার জন্য আমার কোয়ার্টারে আসত। একদিন তারা সংকোচ ত্যাগ করে বলল, "ওস্তাদজী! এখন বালেগ হয়ে গিয়েছি। আমাদের ওস্তাদজীর কাছে গিয়ে কুরআন পড়তে লজ্জাবোধ করি। যদি আপনি আমাদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেন তবে খুবই বাধিত হবো"। তা-ই হলো। তারা তাদের কায়দা নিয়ে আমার কাছে কুরআন শিখতে শুরু করল।

মাঝে মাঝে মসজিদ ও আমার আবাসন গৃহ পরিষ্কার করার জন্য সকলকে নিয়ে ওয়াকারে আমল করতাম। আমার ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বালাতি, মগ, পানি ঝাড়ু নিয়ে এসে আমার সাথে হৈ-হুল্লুড় করে পরিচ্ছন্নতার কাজে যোগ দিত। বেশ প্রাণবন্ত লাগত। মায়েরা এসেও আমার কাজে সহায়তা করতেন। আমি সংকোচ বোধ করতাম। তাদেরকে নিষেধ করতাম কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে আমাকে হাসিমুখে সেবা দিত।

একদিন এক অ-আহমদী মহিলা এসে বলে, 'ওস্তাদজী? আমার ছেলে (৮/৯ বছর) খুবই জেদী। সে কারোর কথাই শুনে না। তাকে আপনি মানুষ করে দিন। আমাদের নিজস্ব ওস্তাদজীর কাছে সে যায় না। তাকে বড় কোর্তা পরতে হবে। সে বায়না ধরেছে তাকে বড় কোর্তা কিনে দিতে হবে। নতুবা সে কুরআন শিখতে যাবে না। ছেলে আমার নিষেধ মোটেই শুনেনা। তাকে কোর্তা বানিয়েই দিতে হবে। কিন্তু আমি এ লম্বা পোশাক মোটেই পছন্দ করি না। ছেলে তা মোটেই শুনে না। আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন। আমি সে ছেলেকে আমার কাছে ডেকে এনে সাবলিল আদরে কাঁধে হাত বুলিয়ে কোর্তা বানানোর জন্য নিষেধ করি কারণ মায়ের ইচ্ছাই সবচেয়ে বড়। অতঃপর সে আর সে পোশাক নেয়ার বায়না ধরে নি। এক অ-আহমদী মহিলার ছেলে বিদেশ যাবে। তাঁদের মৌলভীকে না বলে ঐ মহিলা আমাকে দাওয়াত করে ভোজন করিয়েছেন এবং দোয়া করতে অনুরোধ করেছেন।

দূর্গারামপুর আমার খুবই পিয়ারের জায়গা, কারণ সিলসিলায় মুরব্বী হিসাবে দুর্গারামপুর জামা'ত হয়েই আমার যাত্রা শুরু। আমি দূর্গারামপুরের স্নেহ-মমতা সে পরিবেশের কথা কখনো ভুলব না। সেখানকার আহমদী নন-আহমদী সবার কাছেই আমি খুব ভালবাসার মানুষ ছিলাম। বেলাল ভাইয়ের ইঞ্জিল চালিত নৌকা। যদ্বারা তিনি যাত্রী ও মালামাল ভাড়ায় বহন করতেন। আমি প্রায়ই বিনা ভাড়ায় নবীনগর ও ভৈরব বাজার ভ্রমণ করতাম। নদী পথের ভ্রমণ বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য। সে কথা ক্ষণে ক্ষণেই স্মৃতিপটে জাগে।

এক নন-আহমদী মহিলা আমাদের জামা'তের খুবই বিরোধী, আমি স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে জামাতী দাওয়াত পৌঁছাই। সালাম বিনিময় করি। শেষটায় তিনি আমাদের ব্যবহারে তার বিরোধী স্বভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

দূর্গারামপুর হতে অন্যত্র যাত্রাকালে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল। কারণ আমি সেখানকার পরিবেশের সাথে চারা গাছ থেকে বড় গাছ হয়ে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছিলাম। বিদায় বেলা নদীর ঘাটে ২ জন নন-আহমদী মহিলা ২ গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আমাকে খাওয়ানোর জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি সস্নেহে বোনদ্বয়কে বললাম, সফরের সময় পথে আমি দুধ খাই না। তাঁরা মর্মাহত হলেন। শেষটায় তাঁরা বললেন, "আমরা কী আবার আপনাকে কখনো আমাদের মাঝে পাব"? আমি অশ্রুসিক্ত চোখে বললাম, আমার জন্য দোয়া করবেন। নৌকা ছেড়ে দিল। দূর্গারামপুর ও সে গ্রামের মমতাকে পিছনে রেখে নতুন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবার কল্যাণ করুন। সহায় হউন।

সেখানে থাকাকালীন সময়ে ২টি কবিতা লিখেছিলাম। পরবর্তীতে তা পাক্ষিকে ছাপানোর চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ্।

# বিজ্ঞপ্তি

**তালীম দপ্তর,**
**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**

তালীম দপ্তর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে **২০১৭ সালে** সর্বশেষ পরীক্ষায় **অংশগ্রহণ করে** ভাল ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের আগামী ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯৪তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জনকারী ৮ম শ্রেণী এবং তদূর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। এ জন্য ইতিমধ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের যে সকল শিক্ষার্থীরা সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য, স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে সে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। তাই এ বিষয়ে আপনাদের সকলকে বিশেষ যত্নবান হওয়ার অনুরোধ করছি। আরও উল্লেখ থাকে যে, কোন শিক্ষার্থী যদি আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম না পান, সেক্ষেত্রে সাদা কাগজে মুল শিক্ষাসনদের ফটোকপি সংযুক্ত করে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবর আবেদন পাঠাতে পারবেন।

**জামালউদ্দিন আহমদ**
সেক্রেটারী তালীম

# ইসলাম: বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

(৩য় কিস্তি)

## ইসলামে মানব-বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে

ইসলাম, মানব-বিবেককে সুতীক্ষ্ম ও শাণিত করে সংবেদী আর বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে প্রত্যেককে নিজ নিজ মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। সকল নবীগণের নিজ দাবীর প্রতি বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যতা প্রতিপাদনে পবিত্র কুরআন সমস্ত ঐশী কিতাবের মধ্যে অনন্য। আল্লাহ তা'লার প্রত্যাদেশবাণীর বাস্তবতা অনুধাবন এবং সেই আলোকে ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তা প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন মানুষের বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ঘোষণা দিয়েছে:

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙ قَدۡ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَ يُؤۡمِنۡ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى ۗ لَا انۡفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۵۷﴾

অর্থাৎ- ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নাই। নিশ্চয় সৎপথ ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে বিদ্রোহী শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা ভাংবার নয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা-২:২৫৭)

ধর্মবিষয়ে প্রদত্ত স্বাধীনতা নিশ্চিত করে আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে-

وَقُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكُمۡ ۟ فَمَنۡ شَآءَ فَلۡيُؤۡمِنۡ وَّمَنۡ شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ ۚ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا لِلظّٰلِمِيۡنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنۡ يَّسۡتَغِيۡثُوۡا يُغَاثُوۡا بِمَآءٍ كَالۡمُهۡلِ يَشۡوِى الۡوُجُوۡهَ ؕ بِئۡسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ﴿۳۰﴾

অর্থাৎ- আর তুমি বল, 'এ সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক।' আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য এমন আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদের ঘিরে রেখেছে। আর তারা (পানির জন্য) আকুতি জানালে গলিত তামার ন্যায় পানি দিয়ে তাদের আকুতি পূরণ করা হবে, যা তাদের মুখমন্ডল ঝলসিয়ে দিবে। কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল! (সূরা আল কাহফ-১৮:৩০)

পবিত্র কুরআনে এত সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি মানবজাতিকে আহ্বানকালে কিংবা মানুষের কাছে ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপনায় কোন প্রকার চাপ বা বল প্রয়োগ করা হলে তা হবে অবান্তর আর এর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা বরদাস্ত করবেন না। ঈমান আনয়ন বা ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিপালনের বেলায় প্রকৃতই কোনও চাপ বা জবরদস্তি সম্ভব নয়, কেননা মহানবী (সা.) স্বয়ং স্বজাতির প্রতিকূল এক জোটের বিরুদ্ধে একা অরক্ষিতাবস্থায় দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং তিনি (সা.) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সাহাবাগণ (রেজওয়ানাল্লাহু আলাইহিম) মক্কায় অবস্থানকালে তেরো বছর ধরে সবচেয়ে তিক্ত, নিষ্ঠুর ও অবিরাম নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

তাইতো আমরা দেখি, ইসলামে বর্ণিত নীতিমালায় ধর্ম-প্রচার ও ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে:

لِيَحۡمِلُوۡۤا اَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةً يَّوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ۙ وَمِنۡ اَوۡزَارِ الَّذِيۡنَ يُضِلُّوۡنَهُمۡ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوۡنَ ﴿۲۶﴾

অর্থাৎ- তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তুমি সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক

কর। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবচেয়ে ভালো জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভালো জানেন। (সূরা আন নাহল-১৬:১২৬)

কুরআন মজীদে আল্লাহ্-য় বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী অপরাপর ব্যক্তিদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একমত হওয়ার জন্য একটি উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে। সময় ঘনিয়ে আসছে বরং অতি নিকটে বলে মনে হচ্ছে, কারণ সম্প্রসারিত আকারে ইসলামের হৃদয়গ্রাহী আমন্ত্রণ অন্যান্য বিভিন্ন ধর্ম-অনুসারী মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব অর্জনের বাস্তব মাধ্যম আর সাধারণভাবে সকলের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সুরক্ষার কার্যকর বিধিবিধানরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হচ্ছে।

এ প্রাসঙ্গিকতায় পবিত্র কুরআনে এমন নির্দেশই দেয়া হয়েছে -

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

অর্থাৎ- তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন (আর তা হলো এই), আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করি। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা একে অন্যকে যেন প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি।' এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তোমরা (তাদের) বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, নিশ্চয় আমরা আত্মসমর্পণকারী।' (সূরা আলে 'ইমরান-৩:৬৫)

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বে বিশ্বাস স্থাপনে এবং তাঁর সৃষ্টিজগতের এই বিশালত্বের আড়ালে এক মহান ঐশী উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, আর তাই জীবনের সব ক্ষেত্রে মানুষের জবাবদিহিতার উপর ইসলাম জোর দেয়, কেননা পৃথিবীতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইহজাগতিক এবং পারত্রিক, উভজগতের মাঝে সেতুবন্ধন রচনার দায়ভার তারই ওপর বর্তানো হয়েছে, এটিই ইসলামের সারাংশ। অতএব, যে কেউ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বে ঈমান রাখে আর পরকালে বিশ্বাস পোষণ করার সাক্ষ্যদানে ন্যায়পরায়ণতার সাথে অবিরাম প্রচেষ্টারত থাকে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও করুণারাজি এবং কল্যাণের উত্তরাধিকারী সে-ই হয়ে থাকে।

মানুষের মাঝে ধর্মীয় মত-পার্থক্য থাকলেও সহজ সুন্দর সাবলীল জীবনযাপনের এ নীতিই ঐশীবিধান (পবিত্র কুরআন) নির্ধারণ করেছে। যেমন বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

অর্থাৎ- মু'মিন, ইহুদী, সাবী এবং খ্রিষ্টানদের (মাঝে) যে-ই আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে নিশ্চয় তাদের কোন ভয় থাকবে না আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (সূরা আল মায়েদা-৫:৭০)

এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য সার্বজনীন এক স্তরের কথা বলে এবং সকলের কাছে গ্রহণীয় মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের স্বীকৃতির মাধ্যমে ধর্মীয় আবহ সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করে। আর এটা কেবল ইসলামেরই একক বৈশিষ্ট।

## ইসলাম সামাজিক মূল্যবোধ সুরক্ষা করে

আমাদের আজকের সমস্যাগুলো কেবলই ধর্মীয় পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা প্রতিনিয়ত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নানাবিধ অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চলছি। এসব থেকে উত্তরণের জন্য পথনির্দেশনা প্রয়োজন, আর ইসলাম সেই চাহিদা পূরণের পূর্ণ সক্ষমতা রাখে। এবারে উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে ইসলাম কোন্ কাঙ্খিত মান প্রতিষ্ঠিত করে সংক্ষিপ্তভাবে তা তুলে ধরা হচ্ছে।

আমরা দেখেছি, সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলাম সকল বৈষম্য এবং বিশেষায়িত অধিকারগুলো বিলুপ্ত করেছে। সমগ্র মানবজাতিতে রয়েছে সর্বজনীন বিশাল এক ভ্রাতৃত্ব। এটি ইসলামী সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, শত শত বছর ধরে যা অনুসৃত ও প্রতিপালিত হয়ে আসছে এবং ইসলামের বাইরেও তা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। সাধারণ নীতিমালা ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই আরো এক-দু'টি দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস নেব, যা মানুষের মাঝে সমতা ও মর্যাদাবোধ সমুন্নত রেখে এক মেলবন্ধনে বেঁধে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ধরণের পৌরোহিত্য বা যাজকতন্ত্রের সুযোগ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি, পুরুষ বা নারী যে-ই হোক না কেন ঈশ্বরের সাথে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার অধিকার অবশ্যই তার রয়েছে। ইসলাম মানুষ এবং তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী কোন সত্ত্বাকে স্বীকার করে না। এমনকী নবীগণও শুধু গাইড ও শিক্ষক ছিলেন, যারা নিজ জীবনে অনুসৃত শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষের জন্য জীবনধারার সঠিক প্যাটার্ন এবং আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তারা কোন ক্রমেই আল্লাহ্ ও তাঁর

সৃষ্টিকূলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নন। জাগ্রত এই চেতনাবোধ আমাদের প্রত্যেককে এমন মর্যাদাবান করে তোলে যে, মহামহিমান্বিত সেই সত্তার নৈকট্যলাভে আমরা অনুপ্রাণিত হই। ইসলামের অন্যতম দৈনন্দিন ফরয ইবাদত পাঁচ বেলার নামাযে অংশগ্রহণকারী খুব স্পষ্ট আর বাস্তব এই অভিজ্ঞতা লাভ করে যে, প্রতি বেলার নামাযে যখনই সে মসজিদে উপস্থিত হয়, পুরো চেতনাতে সে জানে, একজন মানুষ হিসাবে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে অন্য সকলের সমান,কারো চেয়েই সে পিছিয়ে নেই।

এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٢﴾

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ
وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ
كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا
وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾

(সূরা আল আ'রাফ-৭:৩২-৩৪)

অর্থাৎ- হে আদমসন্তান! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদেরকে (তাকওয়ার পোষাকে) সুসজ্জিত কর এবং আহার কর ও পান কর, তবে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (৭:৩২)

তুমি জিজ্ঞেস কর, 'আল্লাহর (সৃষ্ট) সৌন্দর্য ও রিযকের মাঝ থেকে পবিত্র বস্তুগুলো কে হারাম করেছে যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? তুমি বল, 'যারা ঈমান এনেছে এসব ইহকালেও তাদের জন্য (এবং) কিয়ামত দিবসেও বিশেষভাবে (তাদের) জন্য। এভাবেই আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (৭:৩৩)

তুমি বলে দাও, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক কেবল অশ্লীল কাজকে হারাম করেছেন তা প্রকাশ্য হোক বা গোপনই হোক। আর পাপ ও অন্যায় বিদ্রোহকে এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের এমন কিছু শরীক করাকে যার অনুকূলে তিনি কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি (তাও হারাম করেছেন)। আর আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের এমন কথা আরোপ করাকেও (হারাম করেছেন) যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই। (৭:৩৪)

সামাজিক শৃংখলা প্রতিবিধানে ইসলামে নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। যেমন– মদ্যপান, শুকরের মাংস ভক্ষণ, জুয়াখেলা এবং সুদের উপর অর্থ লগ্নি করা বা ধার দেয়া ইত্যাদি, আর এসবই হলো অর্থনৈতিক বা নৈতিকভাবে সামাজিক অবকাঠামো রক্ষা করার নির্ধারিত ব্যবস্থা।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে সততার সংজ্ঞা হল, মানবীয় সকল বৈশিষ্ট ও গুণাবলী এবং শক্তি ও ক্ষমতার পদ্ধতিগত সদ্ব্যবহার। যে কোন প্রকার অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ বা চালাকি চালবাজি ইসলামে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।

(চলবে)

**To Watch Friday Sermon Regularly**

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

# সংবাদ

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগরে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ০২/১২/২০১৭ তারিখ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন জ্যোতি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী আলোচনা করেন রেজোআনা জ্যোতি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহিত নিয়ে বলেন, পাপীয়া খাতুন। বিশ্বশান্তি সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন ফালগুনি। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধীকার নিয়ে আলোচনা করেছেন তাহমীনা হক। মানব অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপরে আলোচনা করেন দীপা। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্টের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

**মর্তজারা বেগম**

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৭/১২/২০১৭ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন নীলুফা ওয়াহাব, হাদীস পাঠ করেন লাবনী, নযম পাঠ করেন কুররাতুল এ্যাইন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে বলেন, সুফিয়া পারভীন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বলেন আমাতুস সামী। নারী জাতির প্রতি উত্তম আচরণ সম্পর্কে বলেন, নাছিমা বশির। খানা-পিনার সরলতা ও খোদা ভিরুতা সম্পর্কে বলেন মিলা পাটোয়ারী। আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভালোবাসা ও আস্থা সম্পর্কে বলেন, আফরোজা মতিন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত দিবসে ৭৭ জন লাজনা ও ২১ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১২/২০১৭ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন কুরআন তিলাওয়াত করেন বিলকিস তাহের। হাদীস শরীফ পাঠ করেন, কুররাতুল আইন। দোয়া করেন আফরোজা মতিন প্রে. লা. ই. আহমদনগর। নযম পাঠ করেন ফারজানা শাওন। এরপর যাবতীয় কল্যাণ কুরআনে নিহীত এ সম্পর্কে বলেন, নাফিয়া শারমিন। অর্থসহ নামায ও এর নিয়মাবলী সম্পর্কে বলেন আফরোজা মতিন। কুরআন ক্লাস ও উর্দু ক্লাস পরিচালনায় নাছিমা বশির। ২য় দিন কুরআন তিলাওয়াত করেন নিলুফা ওয়াহাব হাদীস পাঠ করেন সুরাইয়া সালমুন। নযম পাঠ করেন দৌলতুন্নেছা। সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস এ সম্পর্কে বলেন, নিশাত জাহান। এরপর কুইজ প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়। উক্ত ক্লাসে ১ম দিন ৬৮ জন লাজনা ও ১১ জন নাসেরাত ২য় দিন ৫৮ জন লাজনা ও ১৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

**মিলা পাটোয়ারী**

## নূরনগরে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৩/১২/২০১৭ এবং মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের বিশেষ প্রোগ্রামের জন্য গত ০৮/১২/২০১৭ তারিখ এই দুইদিন আহমদীয়া মুসলিম জামাত নূরনগর এর উদ্যোগে তবলিগী সেমিনার করা হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর হতে এশার পর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দিন জুমুআর নামাযের পর হতে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন হতে লিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ তৌফিক জামাত (মাহী) এরপর আলোচক বৃন্দ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং হযরত মসীহ্ (আ.)-এর জীবনাদর্শ ও তার সত্যতার ওপর আলোচনা করেন ও শেষে প্রশ্ন উত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয় এতে মেহমান ভাইদের প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে ৭ জন মেহমানসহ মোট ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

**মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান**

## শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জের মরহুম মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের বড় ছেলে বশীর আহমদ গত ১ জুন ২০১৭ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রীসহ দুই ছেলে, দুই মেয়ে, মা চার ভাই ৫ বোনসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের আত্মার মাগফেরাত ও পরিবারের সবার জন্য আহমদী সকল সদস্য-সদস্যার নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

**শরীফ আহমদ**
মরহুমের ছোট ভাই
[বি. দ্র.: ভুল সংশোধন পূর্বক পুনর্মুদ্রণ]

# বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

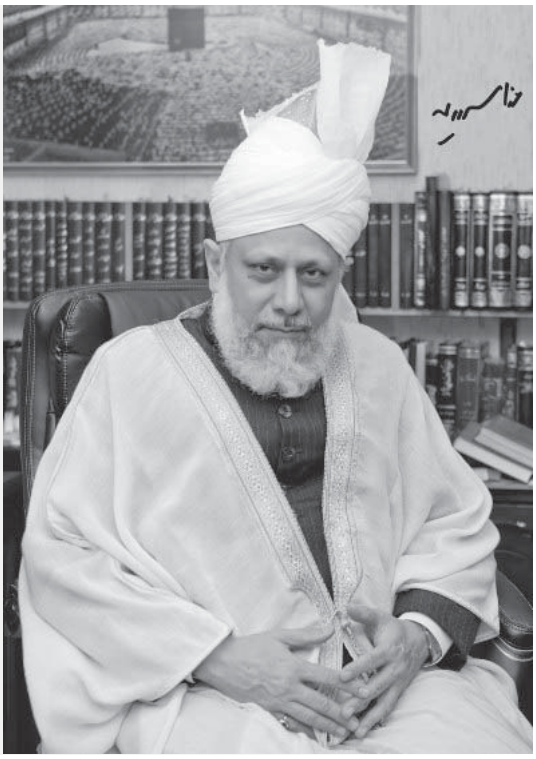

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

**"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"**

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

**"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"**

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

**"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"**

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

**"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"**

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

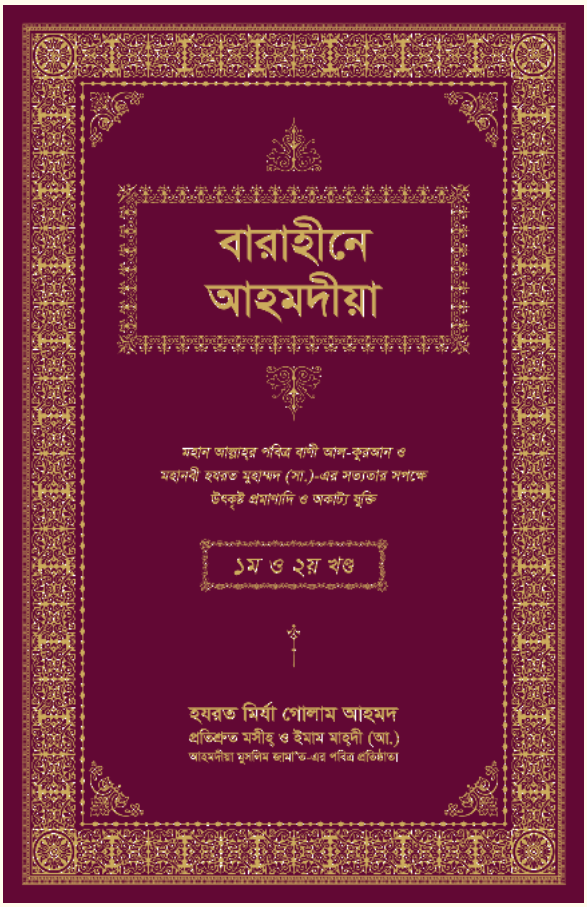


মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

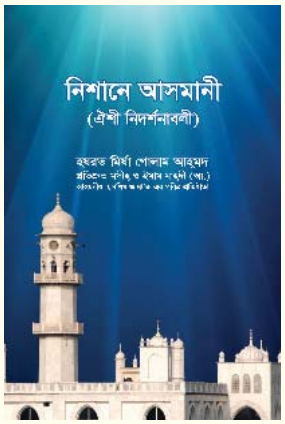


হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

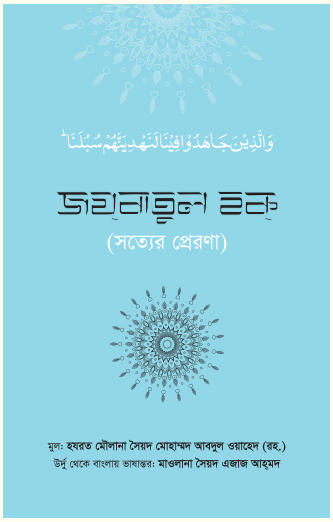


জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির বিক্রয়মূল্য ২০/- মাত্র।

New Vol. No. 80 | 12 Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st December, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

# জলই জীবন/ WATER THERAPY

**জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :**

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

**জল চিকিৎসার নিয়ম :**

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

## এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com